'অন্ধকার থেকে আলোতে' সিরিজের দ্বিতীয় বই
অন্ধকার থেকে আলোতে-২
মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
সমর্পণ
প্রকাশন

"অন্ধকার থেকে আলোতে" সিরিজের প্রথম বই নয় এটি। আর ইন শা আল্লাহ, এটা শেষ বইও হবে না। অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে নিরন্তর। আমরা যদি না করি, তবে আল্লাহ কাউকে-না-কাউকে দিয়ে ঠিকই এ কাজ করিয়ে নেবেন। সত্য নামক আলোর আঘাতে বিচূর্ণ করবেন মিথ্যার অন্ধকারকে।

"আর মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"

[আল কুরআন, বানী ইসরাঈল, ১৭:৮১]

অন্ধকার থেকে আলোতে

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

অন্ধকার থেকে আলোতে ২

ISBN 978-984-8041-17-8

শার'ঈ সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

ভাষা সম্পাদনা

শিহাব আহমেদ তুহিন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক

রোকন উদ্দিন

অনলাইন পরিবেশক

❑রকমারি.কম ❑ওয়াফি লাইফ ❑তারিকজোন

বইমেলা পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়

বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য: ২৫০ টাকা

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন: +৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯

https://www.facebook.com/somorponprokashon

Ondhokar Theke Alote-2 (From darkness to light-2) by *Muhammad Mushfiqur Rahman Minar* published by Somorpon Prokashon, Dhaka, Bangladesh, First Edition in 2019.

সূচিপত্র

শারঈ সম্পাদকের বানী

যখন আদম (আ.) পৃথিবীতে হকের দাওয়াত ও শিক্ষা নিয়ে অবতরণ করেছিলেন তখন ইবলিস শয়তানও বাতিলের দাওয়াত নিয়ে অবতরণ করেছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পথ দুটি—হক ও বাতিল। তৃতীয় কোনো পথ নেই। এই হককে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী-রাসুল প্রেরিত হয়েছেন। অপর দিকে শয়তানের বাহিনী তার মেহনতকে ছড়িয়ে দিতে ও প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নবী ﷺ শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। তাঁর উম্মতকে দ্বীনের কথা শুনে থাকলে তা অপরের কাছে প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর আলেমদের নবীদের উত্তরসূরি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাই তো দেখা যায় যে নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর উম্মতের দরদি ও যোগ্য আলেমগণ দ্বীনের প্রচারের জন্য জীবনকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন।

আজ আমরা 'আধুনিক যুগ' নামক এক সময়ে বাস করছি। যে যুগে বাতিলদের কাছে এক বড় সমস্যার নাম ইসলাম। তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের পথে একমাত্র কাঁটা ইসলাম। তাই তারা ইসলাম ও মুসলিমদের মিটিয়ে দিতে কখনো বুলেট আবার কখনো ইসলামের নামে মিথ্যা প্রচার করে এর ব্যাপারে অমুসলিমদের ভীত আর মুসলিমদের সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলছে। অথচ না আজ তাদের বুলেটের পাল্টা জবাব দেবার হিম্মত আমাদের আছে আর না ইসলামের নামে মিথ্যা প্রচারাভিযান রুখে দিতে আমাদের কোনো চেষ্টা-মেহনত-শক্তি আছে। কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ এই দ্বীনকে শত্রুদের সকল কৌশল থেকে রক্ষা করবেন। তাই তো দেখি, যুগে যুগে আল্লাহর কিছু বান্দা যেমন বুলেটের আঘাতের পাল্টা জবাব দিতে দাঁড়িয়ে যায়, ঠিক আবার তাদের মিথ্যার পেছনে লুকিয়ে থাকা সত্যের আলোকে প্রচার করতে সকল প্রকার প্রচেষ্টা, শক্তি ও মেধা ব্যয় করে। সেই ধারাবাহিকতার একজন ভাই মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার। মুখে বক্তব্য দেওয়ার চেয়ে লেখালেখি করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর একটি কাজ। তার ওপরে যদি হয় গবেষণামূলক লেখালেখি, তাহলে তো

কথাই নেই। আমি তাঁর লেখাগুলো আন্তরিক গুরুত্ব ও সময় নিয়ে পড়েছি। লেখাগুলো পড়ার পর এই কথা আর না বলে পারছি না : হে ভাই, তোমার লেখা পড়তে গিয়ে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি। কেননা, তুমি ইসলামের সত্যকে প্রকাশের জন্য কতই না কষ্ট করেছ। কত সুন্দর করে মানুষকে সেই সত্যগুলো জানতে সুযোগ করে দিয়েছ যেসব বিষয়ের মাঝে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে, মুসলিমের সবচেয়ে দামি সম্পদ, ঈমানকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে দেশি-বিদেশি শত্রুপক্ষ একজোট হয়ে মাঠে নেমেছে। এসব বিষয়ে সংশয়ের জবাবে এ উত্তরগুলোর তো বড়ই প্রয়োজন ছিল। আমাদের মধ্য হতে তুমি বহু ত্যাগ স্বীকার করে নিজের যোগ্যতাকে ব্যবহার করে এসব জবাব দিতে ব্রতী হয়েছ। বাতিলদের এমন-সব দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছ যে, ওরা যদি সত্যিকারের 'মুক্তমনা' হয়, তাহলে এই সত্যের আলো ওদের অন্তরে রেখাপাত করবেই করবে। অন্ধকারের গুহা ছেড়ে ওদের আসতেই হবে সে চিরন্তন আলোর দিকে। আর এর আগেই যদি অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবু এই সূর্যের ন্যায় সত্যের সামনে কথা বলার আগে একবার অন্তত ভাবতে বাধ্য হবে। আর সরলপ্রাণ মুমিনরা হয়তো অন্ধকারের বাসিন্দাদের সেই মিথ্যাগুলো ধরে ফেলতে পারবে। আর কোনোদিন ইন শা আল্লাহ পা দেবে না ওদের ফাঁদে। হে প্রিয়, সত্যিই আল্লাহর জন্য তোমাকে ভালোবাসি। তাঁর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি। তিনি যেন তোমার এ মেহনতকে কবুল করেন।

এই বইয়ের প্রতিটি রেফারেন্স আমি যাচাই করে দেখেছি। যেখানে যেখানে সংশোধন জরুরি, আমি করে দিয়েছি। তবে বইটির উদ্দেশ্য যেহেতু বাংলার সাধারণ পাঠককুল, তাদের যাচাইয়ের সুবিধার্থে বাংলা ভাষার রেফারেন্সের দিকে অধিক লক্ষ রাখা হয়েছে।

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, কোনো বিষয়ে পুরোপুরি নির্ভুল হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র নির্ভুল তো তিনি, যিনি সারা জাহানের স্রষ্টা। তাই কেউ কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলে জানানোর অনুরোধ থাকল। ইন শা আল্লাহ অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে।

বিনীত
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
খুলনা
ই-মেইল : romy570@protonmail.com

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রভু মহান আল্লাহর, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যাঁর কোনো শরীক নেই। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর মহান রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যাঁকে আল্লাহ্ সত্য সহকারে প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে।

দুইটি বিন্দু। একটি বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে হবে। এই বিন্দুটি থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে সোজা পথ কিন্তু একটিই, তা হচ্ছে দুই বিন্দুর মধ্যকার সরলরেখা। ওই রেখাটি বাদে বিন্দু দুটিকে সংযোগকারী আর কোনো রেখাই পরিপূর্ণ সোজা নয়। একই ভাবে স্রষ্টার নিকট পৌঁছানোর সরল ও সোজা পথ একটিই। অন্য সবগুলো পথই বক্র পথ। আর এই সরল পথই হচ্ছে ইসলাম।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলাম।... [১]

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

অর্থ : আর নিশ্চয় এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথের অনুসরণ করবে না, তাহলে তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তোমাদের এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।[২]

---

[১] *আল কুরআন*, আলি ইমরান, ৩ : ১৯

[২] *আল কুরআন*, আন'আম, ৬ : ১৫৩

এই সরল এবং সোজা পথ থেকে মানুষকে বক্র পথে নেবার জন্য আজ দিকে দিকে বিভিন্নভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পোস্টে [৩] ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যুক্তি, রেফারেন্স এসবের তুবড়ি বাজিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করবার যে মহাযজ্ঞ আজ চলছে, তা মনে হয় আগে কখনো এই পরিমাণে হয়নি। সেসবের বিরুদ্ধে ইসলামের সত্যতাকে তুলে ধরে আমার প্রথম প্রয়াস ছিল *অন্ধকার থেকে আলোতে* বইটি ২০১৮ একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আমার দ্বিতীয় প্রয়াস *অন্ধকার থেকে আলোতে-২*। কুফরীর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে আহ্বানের দ্বিতীয় প্রয়াস।

সংশয় নিরসন ও ইসলামের সত্যতার দিকটি তুলে ধরে বইটিতে মোট ১৭টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি সব সময়েই বিশ্বাস করি, ইসলামের সত্যতার সঠিক রূপটি বুঝতে পেরেছিলেন সাহাবীরা, যারা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁর চরিত্রমাধুর্য ও অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন। কী দেখে ৭ম শতাব্দীর সেই অন্ধকার যুগে আরবের অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হলো আর নিজেদের জীবনকে আপাদমস্তক বদলে ফেলল? আমি বিশ্বাস করি, আজও যদি আমরা ইসলামের সত্যতা খুঁজতে যাই, আমাদের চলে যেতে হবে ৭ম শতাব্দীর সেই দিনগুলোতে। যেখানে গেলে আমরা দেখতে পারব মুহাম্মাদ ﷺ নামের মানুষটার কোন দিকগুলো দেখে সেই মানুষগুলো আলোর সন্ধান পেয়েছিল। সেই চিন্তা থেকেই 'তিনটি ঘটনা এবং একটি সত্যের সাক্ষ্য', 'নিঃসঙ্গ পথযাত্রী' ও 'অবিচল আগন্তুক' প্রবন্ধগুলো লেখা। ইসলামের সত্যতা খুঁজতে গিয়ে অনেকে আবার ভুল পথ বেছে নেয়। বর্তমান যুগে ইসলামের মূলমন্ত্রটিই অনেক মুসলিম বুঝতে সক্ষম হয় না। তারা ইসলামের প্রতিটি বিধানের পার্থিব উপকারিতা বা বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা খুঁজতে চায়। অথচ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ইসলামী বিধানগুলো পালনের মূল কারণ কী? মূল কারণ তো এটাই যে, আল্লাহ এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর আত্মসমর্পণকারী বান্দা হিসাবে সেগুলো পালন করি। ইসলাম নিঃসন্দেহে মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্যই কল্যাণকর, কিন্তু প্রতিটি বিধান থেকে পার্থিব উপকারিতা খোঁজা অবশ্যই সঠিক মনোভাব নয়। আর এই দিকটির ভুল প্রয়োগ ঘটিয়ে অনেক মানুষকে সংশয়ে ফেলার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে 'নামাজ-রোজার কি আসলেই কোনো পার্থিব উপকারিতা আছে?' প্রবন্ধটি।

---

[৩] তাদের বিজ্ঞাপন হবার আশঙ্কা না থাকলে লিংকসহ এদের কথা উল্লেখ করে দেওয়া যেত।

নাস্তিকতার যুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'Problem of Evil'।[৪] এর সাথে সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন হচ্ছে : আল্লাহ কেন শয়তানকে সৃষ্টি করলেন, যেখানে শয়তান তাঁর নিজ সৃষ্টিকেই কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে। এর উত্তরের সন্ধান থেকেই 'আল্লাহ কেন শয়তান সৃষ্টি করলেন?' প্রবন্ধটি। 'সড়কে নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ মূলনীতি এবং "মুক্তির রাস্তা"' প্রবন্ধটি এ বছর (২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ) জুলাই-আগস্ট মাসে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী "নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন"[৫] এর প্রেক্ষাপটে লেখা। আমাদের দেশের বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধান ইসলামের মধ্যে আছে। আধুনিক যুগের সড়কের সমস্যাগুলো দূর করার উপায়ও যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের মাঝে আছে, তা এই লেখায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আল কুরআনের উৎসমূল নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে 'কুরআন কি আসলেই প্রাচীন কবি ইমরুল কায়েসের কবিতা থেকে কপি করে লেখা?' এই প্রবন্ধটি। আল কুরআনকে ভুল প্রমাণের জন্য খ্রিষ্টান মিশনারি আর নাস্তিক মুক্তমনাদের অন্যতম জনপ্রিয় একটি অভিযোগ হচ্ছে : কুরআন নাকি দাবি করে সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায়। নাস্তিক এক্টিভিস্টদের ফেসবুক গ্রুপ বা পেইজে গেলে এই অভিযোগটি অবশ্যই চোখে পড়বে। এর সাথে তাদের সম্পূরক অভিযোগ—কুরআন নাকি পৃথিবীকে সমতল বলে দাবি করে। প্রাচীন ইসলামী আলেমদের অভিমতের ভিত্তিতে তাদের এই অভিযোগের খণ্ডন করা হয়েছে 'কুরআন কি সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যাবার কথা বলে? কুরআন কি পৃথিবীকে সমতল বলে?' এই প্রবন্ধে। 'আল্লাহ কী করে শেষরাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসতে পারেন যেখানে পৃথিবীর সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় শেষরাত থাকে' এই প্রবন্ধটিতেও প্রায় পুরো অংশে প্রাচীন ইমামদের উদ্ধৃতি নিয়ে এসে ইসলামের সমালোচকদের অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি। নিজের বক্তব্য সেভাবে যুক্ত করিনি।

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের মাঝে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সকল স্থানের জন্য

---

[৪] David Hume in his Dialogues Concerning Natural Religion (1779): "Is [God] willing to prevent evil, but not able? Then is he impotent. Is he able, but not willing? Then is he malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?" Since well before Hume's time, the problem has been the basis of a positive argument for atheism: If God exists, then he is omnipotent and perfectly good; a perfectly good being would eliminate evil as far as it could; there is no limit to what an omnipotent being can do; therefore, if God exists, there would be no evil in the world; there is evil in the world; therefore, God does not exist.

From: "problem of evil : Definition, Responses, & Facts _ Encyclopædia Britannica"
https://www.britannica.com/topic/problem-of-evil

[৫] "২০১৮-র নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন - উইকিপিডিয়া"
https://bn.wikipedia.org/wiki/২০১৮-এর নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন

সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আছে। একটি দেশ যদি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা শাসিত হয়, তাহলে কেমন হবে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা? পশ্চিমা মিডিয়া ও ইসলামবিরোধী লেখকদের অভিযোগ, এমন রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রতি শোষণ-নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসবে, জিজিয়া দ্বারা তাদের পিষ্ট করা হবে। এ অভিযোগের কি আদৌ কোনো বাস্তবতা আছে? এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'জিজিয়া কি আসলেই শোষণমূলক বিধান?' প্রবন্ধে। গিরগিটি হত্যার কিছু হাদিস দেখে আমার নিজেরও একসময়ে কৌতূহল হতো—এমন একটি নির্দেশ কেন দেওয়া হলো? 'হাদিসে গিরগিটি (ওয়াযাগ) হত্যার বিধান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে এই বিধানের কারণ ও হিকমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আহলে বাইতদের[৬] অধিকার খর্ব করে হাদিসশাস্ত্রে জালিয়াতির একটি মিথ্যা অভিযোগ শিয়াদের পক্ষ থেকে তোলা হয়। নাস্তিক-মুক্তমনাদেরও দেখা যায় সুযোগ বুঝে হাদিসশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে। 'কুরআন ও সুন্নাহ নাকি কুরআন ও আহলে বাইত' প্রবন্ধে একই সাথে শিয়া, আহলে কুরআন ইত্যাদি দলগুলো এবং নাস্তিক-মুক্তমনাদের এমন কিছু অভিযোগের অপনোদন করা হয়েছে। 'কুরআনে কি আসলেই খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে ভুল তথ্য আছে', 'কা'বা ও আল-আকসা নির্মাণের সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে হাদিসের তথ্য কতটুকু সঠিক', 'ইহুদিরা কি আসলেই উজাইর (Ezra)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে?'—এই প্রবন্ধগুলোতে কুরআন ও হাদিসের সঠিকত্ব নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারিদের উত্থাপিত কিছু অভিযোগের অসারতা দেখানো হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম-বিশ্বে যুদ্ধপীড়িত পরিস্থিতি ও সংকটময় অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বাংলাদেশের নাস্তিক-মুক্তমনা সম্প্রদায় নানা সময়ে কটাক্ষ করে। তারা বলে : মুমিনরা যদি সত্য ধর্মের ওপর থাকত, তাহলে তাদের আজ এ দশা কেন? ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হলে তাদের এত সমৃদ্ধ অবস্থা কেন? তাদের এ-জাতীয় বিদ্রূপের বাণ দেখে অনেক সরলমনা মুসলিম হীনম্মন্যতায় ভোগে। এ বিষয়টি লক্ষ করে 'মুসলিমদের দুরবস্থা এবং ইসলামের সত্যতা' প্রবন্ধটি লেখা। ইসলামের উৎসমূলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, ইসলামে যে স্রষ্টার কথা বলা হয় (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) স্বয়ং তাঁকে পৌত্তলিক বলে প্রাচ্যবিদ আর ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন রকম তত্ত্ব তৈরি করে রেখেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম 'বিখ্যাত' হচ্ছে : চন্দ্রদেবতা তত্ত্ব। ইন্টারনেটে ইসলাম সম্পর্কে সার্চ দিলেও অনেক সময়ে এ-জাতীয় অনেক প্রোপাগান্ডা আর্টিকেল চলে আসে। এই মিথ্যাচারকে খণ্ডন করে লেখা হয়েছে 'আল্লাহ : চন্দ্রদেবতা (Moon god) নাকি সারা জাহানের পালনকর্তা' এই প্রবন্ধটি।

---

[৬] নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার

সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আছে। একটি দেশ যদি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা শাসিত হয়, তাহলে কেমন হবে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা? পশ্চিমা মিডিয়া ও ইসলামবিরোধী লেখকদের অভিযোগ, এমন রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রতি শোষণ-নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসবে, জিজিয়া দ্বারা তাদের পিষ্ট করা হবে। এ অভিযোগের কি আদৌ কোনো বাস্তবতা আছে? এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'জিজিয়া কি আসলেই শোষণমূলক বিধান?' প্রবন্ধে। গিরগিটি হত্যার কিছু হাদিস দেখে আমার নিজেরও একসময়ে কৌতূহল হতো—এমন একটি নির্দেশ কেন দেওয়া হলো? 'হাদিসে গিরগিটি (ওয়াযাগ) হত্যার বিধান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে এই বিধানের কারণ ও হিকমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আহলে বাইতদের[৬] অধিকার খর্ব করে হাদিসশাস্ত্রে জালিয়াতির একটি মিথ্যা অভিযোগ শিয়াদের পক্ষ থেকে তোলা হয়। নাস্তিক-মুক্তমনাদেরও দেখা যায় সুযোগ বুঝে হাদিসশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে। 'কুরআন ও সুন্নাহ নাকি কুরআন ও আহলে বাইত' প্রবন্ধে একই সাথে শিয়া, আহলে কুরআন ইত্যাদি দলগুলো এবং নাস্তিক-মুক্তমনাদের এমন কিছু অভিযোগের অপনোদন করা হয়েছে। 'কুরআনে কি আসলেই খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে ভুল তথ্য আছে', 'কা'বা ও আল-আকসা নির্মাণের সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে হাদিসের তথ্য কতটুকু সঠিক', 'ইহুদিরা কি আসলেই উজাইর (Ezra)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে?'—এই প্রবন্ধগুলোতে কুরআন ও হাদিসের সঠিকত্ব নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারিদের উত্থাপিত কিছু অভিযোগের অসারতা দেখানো হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম-বিশ্বে যুদ্ধপীড়িত পরিস্থিতি ও সংকটময় অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বাংলাদেশের নাস্তিক-মুক্তমনা সম্প্রদায় নানা সময়ে কটাক্ষ করে। তারা বলে : মুমিনরা যদি সত্য ধর্মের ওপর থাকত, তাহলে তাদের আজ এ দশা কেন? ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হলে তাদের এত সমৃদ্ধ অবস্থা কেন? তাদের এ-জাতীয় বিদ্রূপের বাণ দেখে অনেক সরলমনা মুসলিম হীনম্মন্যতায় ভোগে। এ বিষয়টি লক্ষ করে 'মুসলিমদের দুরবস্থা এবং ইসলামের সত্যতা' প্রবন্ধটি লেখা। ইসলামের উৎসমূলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, ইসলামে যে স্রষ্টার কথা বলা হয় (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) স্বয়ং তাঁকে পৌত্তলিক বলে প্রাচ্যবিদ আর ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন রকম তত্ত্ব তৈরি করে রেখেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম 'বিখ্যাত' হচ্ছে : চন্দ্রদেবতা তত্ত্ব। ইন্টারনেটে ইসলাম সম্পর্কে সার্চ দিলেও অনেক সময়ে এ-জাতীয় অনেক প্রোপাগান্ডা আর্টিকেল চলে আসে। এই মিথ্যাচারকে খণ্ডন করে লেখা হয়েছে 'আল্লাহ : চন্দ্রদেবতা (Moon god) নাকি সারা জাহানের পালনকর্তা' এই প্রবন্ধটি।

---

[৬] নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার

আমি আমার সবটুকু চেষ্টা করেছি, বইটিকে সবদিক থেকে তথ্যসমৃদ্ধ করার। তাই যারা ওহীর জ্ঞানের ওপর আস্থা রাখেন, আশা করি তারা বইটি পড়ে তাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করতে পারবেন। আর যারা কেবল ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর বিশ্বাস রাখেন, তাদের জন্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণাদি যুক্ত করেছি। যেহেতু ইসলাম নিয়ে অধিকাংশ মিথ্যা-অভিযোগ করে খ্রিষ্টান-মিশনারিরা, আর এ দেশের নাস্তিকরা সেগুলো ওহীর মতোই সত্যজ্ঞান করে, তাই কিছু অভিযোগ অপনোদনে বাইবেল ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্যই, একজন মুসলিম হিসাবে আমার কাছে কুরআন এবং সুন্নাহই যথেষ্ট।

বইটি লিখতে বেশ অনেকে জনের কাছ থেকেই সাহায্য পেয়েছি। সকলের নাম তো এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবু কয়েক জনের নাম উল্লেখ করি। অনুজপ্রতিম শিহাব আহমেদ তুহিন প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অসাধারণভাবে ভাষা সম্পাদনা করে আমার কাঠখোট্টা লেখাগুলোকে পাঠযোগ্য অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আরেক জনের কথাও না বললেই নয়, তিনি আমার সার্বক্ষণিক উস্তাদ মুফতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ভাই। বিভিন্ন সময়েই নানা তথ্য ও পরামর্শের দ্বারা তিনি আমাকে সাহায্য করেন, আমার লেখাগুলো যাচাই করে দেন। এই বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য রয়েছে। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও অনেক সময় নিয়ে বইটি শারঈ নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন। এই বই লিখতে যাদের থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাদের সকলকে আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দিন।

গত বইমেলায় প্রকাশিত *অন্ধকার থেকে আলোতে* বইয়ের ‘লেখকের কথা’ অংশে ইসলামবিরোধীদের জবাব ও সংশয়ের নিরসন নিয়ে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস **www.response-to-anti-islam.com** ওয়েবসাইটের কথা উল্লেখ করেছিলাম। ইসলামের শত্রুদের জবাব ও খণ্ডনের ব্যাপারে তথ্যভান্ডার এই ওয়েবসাইটের কলেবর এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সম্প্রতি ওয়েবসাইটের লেখাগুলো নিয়ে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে গিয়ে অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে।

কী অনলাইন, কী অফলাইন—হেন জায়গা নেই যেখানে আজ ইসলামের শত্রুদের বিচরণ নেই। যাদের একমাত্র কাজ কীভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ওদের মতো অন্ধকারে শামিল করানো যায়। চারদিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি নিভু নিভু এক আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছি, সে আলো সবদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পাঠককুলের। যদি একজন মানুষও এই বইটি পড়ে অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আসেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আর আমি দৃঢ়ভাবে

বিশ্বাস করি, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে যে কেউ বইটি পড়ে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে বাধ্য হবেন। অবশ্য, হিদায়াতের মালিক তো কেবল আল্লাহ তা'আলা।

এ বইটিতে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর জিনিস আছে, তা একমাত্র মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফিকের কারণে। আর যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে, তা আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে। আল্লাহ তা'আলার নিকট আকুল প্রার্থনা, তিনি যেন এ ক্ষুদ্র কর্মকে কবুল করে নেন, এই বইয়ের লেখক, প্রকাশক, পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের হেদায়েত ও নাজাতের মাধ্যম করে দেন। সলাত ও সালাম আমাদের নেতা, আল্লাহর খলিল মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সহচরগণের ওপর। প্রথম ও শেষে সর্বদা সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরী
২০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
minar_kuet@hotmail.com
https://www.facebook.com/mdmushfiqur.rahmanminar
www.response-to-anti-islam.com

তিনটি ঘটনা এবং একটি সত্যের সাক্ষ্য

ঘটনা : ১

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন বেশ ধনী মানুষ। ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার মুশরিক কুরাঈশ সৈন্যদলের সাথে ছিলেন। মক্কা থেকে রওনা হবার আগে গভীর রাতে খুব গোপনে বেশ কিছু সম্পদ স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে রেখে যান। মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফির কুরাঈশ সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে বিশ ওকিয়া (স্বর্ণমুদ্রা) সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার আগেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। এ যুদ্ধে পরাজিত মক্কার কুরাঈশদের অনেকেই মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

যখন মুক্তিপণ দেওয়ার সময় আসে, তখন তিনি রাসুল ﷺ-কে বললেন, "আমি তো মুসলিম ছিলাম!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আপনার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিফল দেবেন। আমরা তো শুধু প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের ওপর হুকুম দেব। সুতরাং আপনি আপনার নিজের এবং দুই ভাতিজা আকিল ইবন আবি তালিব ও নওফেল ইবন হারিসের মুক্তিপণও পরিশোধ করবেন।"

আব্বাস আবেদন করলেন, "আমার এত টাকা কোত্থেকে [আসবে]?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা

আপনি মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সময়ে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন এবং বলেছিলেন[৭], আমি যদি এ যুদ্ধে মারা যাই, তাহলে এ মাল ফযল, আবদুল্লাহ্ ও কুছামের সন্তানদের দিয়ো?"

আব্বাস বললেন : "আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন! আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর কাছে দিয়েছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো লোক জানত না!"

রাসুল ﷺ বললেন : "সে ব্যাপারে আমার রব আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন।"[৮]

আব্বাস বললেন, আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনি আল্লাহর রাসুল! কেননা, এই লুকানো সম্পদের কথা আমি আর উম্মুল ফযল ছাড়া আর কেউই জানত না।[৯]

তিনি শাহাদাহ্ পাঠ করলেন, ইসলামে দাখিল হলেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

ঘটনা : ২

খাইবারের দুর্গ বিজয়ের পর এক ইহুদি মহিলা বকরির মাংসে বিষ মিশিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে মেরে ফেলার চেষ্টা করল। একজন সাহাবী মারাও গেলেন।[১০] এর কিছুক্ষণ পরের ঘটনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন : "এখানে যত ইহুদি আছে আমার কাছে তাদের একত্র কর।"

তাঁর কাছে সকলকে একত্র করা হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : "আমি তোমাদের কাছে একটা ব্যাপারে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে?"

---

[৭] এ অংশটুকু *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে* আছে।

[৮] *কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির)*, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ১ম খণ্ড, সুরা আনফালের ৭০ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ৯২৮-৯২৯

[৯] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির (র.) (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫২২

[১০] *জামিউল মাসানিদ* (ইবনুল জাওযি), ৮/৪২৪, হাদিস নং ৭৭৫৮

তারা বলল : "হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম।" [মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপনাম]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তোমাদের পিতা কে?"

তারা বলল : আমাদের পিতা অমুক...।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা মিথ্যে বলেছ; বরং তোমাদের পিতা অমুক। [তিনি তাদের সত্যিকার বাবার নাম বলে দিলেন]

তারা বলল : "আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন।"

এরপর তিনি বললেন : "আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তাহলে কি তোমরা সে ক্ষেত্রে আমাকে সত্য কথা বলবে?"

তারা বলল : "হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম, যদি আমরা মিথ্যে বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে।"...[১১]

যারা খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল, তাদের কাছে এভাবে তিনি নিজ নবুয়তের সত্যতার একটা চিহ্ন দেখিয়ে গেলেন। সঠিকভাবে তাদের বাবার নাম বলে দিয়ে আসলেন।[১২] তারাও দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিল যে, তারা মিথ্যা বলার পরেও রাসুলুল্লাহ ﷺ সঠিকভাবে তাদের বাবার নাম বলে দিয়েছেন। এবং তারা এরপর মিথ্যা বললে সেটাও রাসুলুল্লাহ ﷺ ধরে ফেলবেন।

ঘটনা : ৩

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। মক্কা বিজয় করে মুসলিমগণ নগরে প্রবেশ করার পর যখন রাতের আগমন হলো, তখন রাতভর তাঁরা তাকবির-ধ্বনি ও কালিমার আওয়াজে চারিদিক মুখরিত করে রাখলেন। এভাবে সকাল হয়ে গেল।

তখন আবু সুফিয়ান স্ত্রী হিন্দকে ডেকে বললেন, "দেখো না, এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে।"

হিন্দ বলল, "হ্যাঁ, এ আল্লাহর পক্ষ থেকেই।"

---

[১১] *সহীহ বুখারী*, হাদিস নং : ৫৭৭৭

[১২] সঠিকভাবে এতগুলো লোকের বাবা অথবা পূর্বপুরুষের নাম বলে দেওয়া কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। সে যুগে জন্ম নিবন্ধন করা হতো না, কোনো ডাটাবেসও ছিল না।

কুরাঈশদের নেতা আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দ সব সময়েই ইসলামের বিরোধিতা করে আসতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে করে তারা এতদিন অনেক কিছুই করে এসেছেন।

এরপর আবু সুফিয়ান খুব সকালে উঠে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তুমি হিন্দকে বলেছিলে, "দেখো না, এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে। আর হিন্দ বলেছিল, হ্যাঁ, এ আল্লাহর পক্ষ থেকে।"

তখন আবু সুফিয়ান বলল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। সেই আল্লাহর কসম, যার নামে কসম খাওয়া হয়, আমার এ কথা হিন্দ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি শোনেনি!"[১৩]

অনলাইন জগতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে অনেক কিছুই ইদানীং লেখা হচ্ছে। নাস্তিক-মুক্তমনা ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা কুরআন, হাদিস, সিরাত এসব সূত্র থেকেই বিভিন্ন ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কোনো নবী ছিলেন না; বরং তিনি জোর-জুলুম করে আরব দেশে একটা নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন! (নাউযুবিল্লাহ) তিনি নাকি তাঁর নবুয়তের কোনো নিদর্শন (signs) বা প্রমাণ দেখিয়ে যাননি। (নাউযুবিল্লাহ) তারা এত সিরাত অধ্যয়ন করেন, ওপরের ঘটনাগুলোর একটিও কি তাদের চোখে পড়েনি? গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহই রাখেন, আর তিনি তাঁর নবীদের নিকট ওহীর দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন।[১৪] মুহাম্মাদ ﷺ যদি আল্লাহর নবী না-ই হয়ে থাকতেন, তাহলে তিনি কী করে ওপরের ৩টি ঘটনায় গোপন সংবাদগুলো বলে দিলেন? কোনো 'বিজ্ঞানমনস্ক' চেতনা বা অন্য কোনো চেতনা দিয়ে কি এগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে? যে সূত্রগুলো (হাদিস ও সিরাতগ্রন্থ) ব্যবহার করে ইসলামের শত্রুরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান, সে সূত্রগুলো থেকেই তো এ ঘটনাগুলো নেওয়া। তারা যদি এ ঘটনাগুলো অবিশ্বাস করেন বা অগ্রহণযোগ্য বলেন, তাহলে আমরা তাদের বলব : তাহলে আপনারা কোন মুখে ইসলামকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য হাদিস ও সিরাত থেকে কোট করেন? ওই কাজগুলোও তাহলে বন্ধ করুন। সরাসরি বলে দিন : আমরা কোনো ইতিহাস বিশ্বাস করি না! এত ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কেন আপনাদের?

ওপরের ৩টি ঘটনার মতো আরও বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে হাদিস ও

---

[১৩] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির (র.) (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫২২

[১৪] "No one knows the unseen in the absolute sense except Allaah".—islamQa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/101968

সিরাতগ্রন্থগুলোতে। সবগুলো একত্র করলে একটি বই হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।[১৫] ওপরের ঘটনাগুলো একটি মহাসত্যেরই সাক্ষ্য দেয়—মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।

"এগুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি তোমার [মুহাম্মাদ ﷺ] কাছে ওহী মারফত পৌঁছে দিচ্ছি। ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার জাতি। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।"[১৬]

"তিনি [আল্লাহ] অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসুল ছাড়া। আর তিনি তখন তাঁর সামনে ও তার পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন। যাতে তিনি এটা জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কি না। আর তাদের কাছে যা রয়েছে, তা তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গুনে গুনে হিসাব করে রেখেছেন।"[১৭]

---

[১৫] নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর এরূপ আরও অনেক মুজিজার উল্লেখ পাওয়া যাবে এই বইগুলোতে : *মুজিজাতুর রাসুল*, মুস্তফা মুরাদ এবং *মুজিজাতুর রাসুল*, মাসউদ হুসাইন মুহাম্মাদ

[১৬] *আল কুরআন*, হুদ, ১১ : ৪৯

[১৭] *আল কুরআন*, জিন, ৭২ : ২৬-২৮

নামাজ-রোজার কি আসলেই কোনো পার্থিব উপকারিতা আছে?

প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন উদ্ভট পোস্টের দেখা মেলে। সালাত পড়ার এক শটি উপকারিতা, সাওম পালন করলে ক্যান্সার থেকে মুক্তি, টাখনুর ওপর কাপড় পরার যে উপকারিতার কথা জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, ইত্যাদি। এসব লেখায় সত্য যে একেবারে থাকে না তা নয়, তবে অনেক সময় কাল্পনিক তথ্যের সাহায্য নিয়ে বেশ হাস্যকর কথা লেখা হয়। যুগটা বিজ্ঞানের বলেই হয়তো যেকোনো পোস্টের চেয়ে এসব পোস্ট অনেক মুসলিমদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আচ্ছা, এর উল্টোটা যদি দেখা যায়? কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে, নামায-রোযা নিয়মিত পালন করলে আমাদের শরীরে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে, তখন আমরা কী করব?

এই তো ক'দিন আগেই দেখলাম এক মুক্তমনা লিখেছে, সলাত বা নামাজের নাকি অনেক শারীরিক অপকারিতা আছে। তাই সলাত আল্লাহর দেওয়া বিধান হতে পারে না!!! সলাতের 'শারীরিক অপকারিতা' (!)-এর ব্যাপারে সে বা তারা যা লেখে, সেগুলো খণ্ডন করা যায়। কিন্তু আমার এই প্রবন্ধটি তার সেসব যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য নয়; বরং একধরনের ভ্রান্ত মানসিকতাকে খণ্ডন করার জন্য। যে মানসিকতার জন্য এইসব বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নাস্তিক-মুক্তমনাদের অখাদ্য ধরনের লেখাগুলোও মুসলিমদের মাঝে ফিতনা তৈরি করছে।

ইসলামের বিধানগুলোর বিভিন্ন দুনিয়াবি উপকার আছে সত্য। কিন্তু বিধানগুলো কি আমরা সেই পার্থিব উপকারের জন্য পালন করি?

সলাত, সিয়াম (রোজা) কিংবা আল্লাহর অন্য বিধানগুলোর মধ্যে অজস্র দুনিয়াবি উপকারিতা আছে। যেমন : সলাতের দ্বারা উত্তম শারীরিক ব্যায়াম হয়। সিয়াম পালন করা হলে তা শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমানোতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এই বিধানগুলোতে যদি এসব পার্থিব উপকারিতা না থাকত, তাহলে কি আমরা এগুলো পালন করতাম না?

উত্তর হচ্ছে, আমরা তবুও এগুলো পালন করতাম।

আমরা এই বিধানগুলো পালন করি একমাত্র এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো পালনের আদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া এগুলো পালনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

বর্তমান যুগে ইসলামের অনেক দাঈ আছেন, যাঁরা আল্লাহর বিধানগুলোর দুনিয়াবি উপকারিতা বর্ণনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁরা চান যে এর দ্বারা সাধারণ মানুষ বিধানগুলোর মাহাত্ম্য অনুধাবন করে ও এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন অনেক মানুষ এই ব্যাপারে একটি ভুল ধারণা করে বসেন। তারা মনে করেন যে, জাগতিক উপকারিতাগুলোই বুঝি এই হুকুমগুলো দেবার কারণ! এ কারণে কেউ কেউ ধারণা করে বসেন যে, শরীরের অতিরিক্ত মেদভুঁড়ি কমিয়ে সুস্থতা দানের জন্যই বুঝি সিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে![১৮] এ কারণেই "আমিন না বলে যাবেন না" টাইপের কোনো লাইক-ভিক্ষুক ফেসবুক পেইজ থেকে যখন পোস্ট দেওয়া হয় টাখনুর ওপর প্যান্ট পরলে প্রজনন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়,[১৯] তখন এটাকেই এ নির্দেশের 'উদ্দেশ্য' মনে করে হাজার হাজার লাইক-শেয়ারে ওইসব পোস্ট ভরে যায়। কিংবা দেখা যায় "আল্লাহ্ অমুক বিধান কেন দিলেন" এ-জাতীয় প্রশ্ন মানসপটে ঘুর ঘুর করে। এই মানসিকতার জন্যই নাস্তিক-মুক্তমনারা যখন সলাত বা ইসলামের অন্য কোনো বিধানের পার্থিব 'অপকারিতা'(?) নিয়ে লেখে, সেগুলো দেখে সরলপ্রাণ ওইসব মুসলিমরা বিভ্রান্ত হয়ে যান। তারা চিন্তা করেন, আল্লাহর কোনো বিধানে কীভাবে জাগতিক বা পার্থিব অপকারিতা থাকতে পারে?

একটা বিষয়ে আমাদের মুসলিমদের বিশ্বাস ঠিক রাখতে হবে যে, কোনো বিধান কুরআন বা সুন্নাহতে আছে কি না সেটাই হচ্ছে একমাত্র দেখার জিনিস। কুরআন বা সুন্নাহতে থাকলে সেটি আল্লাহর বিধান এবং একমাত্র এ জন্যই আমরা এটা পালন করি যে, এই বিধানটি আল্লাহ্ আমাদের পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা পার্থিক উপকার হোক বা অপকার হোক এটা মু'মিনের দেখার বিষয় নয়। মু'মিনের

---

[১৮] সিয়ামের উদ্দেশ্য তাকওয়া বা পরহেজগারী অর্জন করা। দেখুন : সুরা বাকারাহ, ১৮৩ নং আয়াত

[১৯] ভিত্তিহীন একটি কথা

কাজ হচ্ছে আল্লাহর বিধান জানা এবং তা পালন করা। সকল হুকুমের হিকমাহ খোঁজা দুর্বল ঈমানের বৈশিষ্ট্য। এবং এটি কোনো সঠিক পদ্ধতি নয়।

কেন?

কারণ, ইসলামের বেশ কিছু বিধান আছে যার দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে মানুষের দুনিয়াবি 'ক্ষতি' হয়।

অনেকেই হয়তো কথাটা শুনে চমকে উঠতে পারে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ ছিল না। তখন তাহাজ্জুদের সলাত ফরজ ছিল এবং এর জন্য রাতের অন্তত এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকা অপরিহার্য ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ রাতের অধিকাংশ সময়ে সলাতে দণ্ডায়মান থাকতেন। এর ফলে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ব্যথায় তাঁদের পা ফুলে যেত।[২০] কিন্তু তবু তাঁরা আল্লাহর বিধান পালন করতেন। সাহাবীগণ কখনো এই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবার 'স্বাস্থ্যগত উপকার' বা অন্য হিকমাহ খুঁজতেন না; বরং আল্লাহর বিধান পালন করে যেতেন।[২১] দীর্ঘ সময়ে দাঁড়িয়ে থেকে পা ফুলে যাওয়া—জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা একটা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ আল্লাহর পথে বহু যুদ্ধ করেছেন। এই যুদ্ধগুলোর জন্য সাহাবীগণ (রা.) নিজ অর্থ-সম্পদ ও জীবন ব্যয় করতেন। তাবুকের যুদ্ধে সাহাবী আবু বকর (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, উমার (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক ব্যয় করেছিলেন। আর মোট সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন উসমান (রা.)।[২২] এই বিপুল-পরিমাণ অর্থ চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে 'ক্ষতি'। সাহাবায়ে কিরামের (রা.) অনেকেই আল্লাহর

---

[২০] *মুসলিম*, ৭৪৬; আরও দেখুন : *কুরআনুল কারিম বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির* (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া), ২য় খণ্ড, সুরা মুযযাম্মিলের ২ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ২৭০৮

[২১] পরবর্তী সময়ে বিধানটি মানসুখ বা রহিত করা হয়। দেখুন : *কুরআনুল কারিম বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির* (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া), ২য় খণ্ড, সুরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ২৭১৪

[২২] ■ *তিরমিযী*, ৩৬৭৫; *আবু দাউদ*, ১৬৭৮; *দারেমী*, ১৬৬০
■ *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা* (১ম খণ্ড), মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ; পৃষ্ঠা : ৪২

রাস্তায় যুদ্ধ করে আহত হয়েছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছেন এমনকি জীবন দিয়েছেন।[২৩] এগুলো কি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ কোনো লাভজনক জিনিস? কেউ যদি প্রশ্ন করে যে এই বিধানগুলোর 'পার্থিব উপকারিতা' কী, তাহলে এর জবাব কী হবে?

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হচ্ছেন ঈমান ও অনুসরণের ক্ষেত্রে এই উম্মতের মধ্যে উত্তম আদর্শ। তাঁরা আল্লাহর বিধানগুলোর ক্ষেত্রে দুনিয়াবি উপকার খোঁজেননি। দুনিয়াবি উপকার থাক বা না থাক, "আল্লাহর বিধান" এটা জানাই যথেষ্ট। কোনো হুকুম সামনে এলেই তারা বলেছেন,

وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

"...তারা [ঈমানদারেরা] বলে, "আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের রব, আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা চাই, আর আপনারই দিকে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।"[২৪]

আমরা যদি আমাদের আকিদা এভাবে সাহাবীদের (রা.) মতো করে গঠন করি, তাহলে নাস্তিক-মুক্তমনাদের 'সলাতের অপকারিতা(!)'-জাতীয় পোস্ট আর পাত্তা পাবে না। দুনিয়াবি উপকার থাক বা না থাক, আল্লাহর বিধান আমরা মানবই। কারণ, এর দুনিয়াবি উপকার থাকুক বা না থাকুক আল্লাহ আখিরাতে অবশ্যই এর প্রতিদান আমাদের দেবেন। আখিরাতের প্রতিদানই সর্বোত্তম। আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কোনো জ্ঞানপাপী অজমূর্খ নাস্তিক-মুক্তমনার হাতে বন্ধক দিইনি। ওরা সলাত কিংবা অন্য কোনো বিধানের ১০০০টা তথাকথিত অপকারিতা(!) বের করলেও আমরা খুশিমনে ওদের বলে দেব—

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾

"...হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।"[২৫]

---

[২৩]

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

" আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে—তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।"

(আল কুরআন, তাওবা ৯ : ১১১)

[২৪] *আল কুরআন*, বাকারাহ, ২ : ২৮৫

[২৫] *আল কুরআন*, আন'আম, ৬ : ৫৭

কুরআন কি আসলেই প্রাচীন কবি ইমরুল কায়েসের কবিতা থেকে নকল করে লেখা?

অনন্য ও অসামান্য এক গ্রন্থ আল কুরআন। এর সাহিত্যমান, সুদৃঢ় বক্তব্য ও ভাষাগত মাধুর্য সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের নিকট এক বিস্ময় বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। বিবেকবান ও সত্যসন্ধানীরা একে আল্লাহর বাণী হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। আর হবেই-না কেন? এ কুরআন তো নাজিল হয়েছে আসমান ও যমীনের রবের পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী আল কুরআনের কোনোরূপ ত্রুটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে নাস্তিক-মুক্তমনা ও খ্রিষ্টান প্রচারক-চক্র??? নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে—কুরআনের উৎসমূলকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি কুখ্যাত নাস্তিক্যবাদী ব্লগে আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়েছে—কুরআনের কিছু আয়াত নাকি প্রাচীন আরবীয় কবি ইমরুল কায়েসের কবিতা থেকে কপি করে লেখা (নাউযুবিল্লাহ্)। এর অপনোদনের জন্যই এই লেখা।

নাস্তিক-মুক্তমনাদের এই অভিযোগ কোনো মৌলিক অভিযোগ না। বহু আগে থেকেই রবার্ট মোরি, আনিস সরোশসহ বহু খ্রিষ্টান মিশনারি আল কুরআনের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আসছে। তাদের দাবি হচ্ছে, প্রাচীন আরবে মুশরিকদের একটি প্রথা ছিল কবিরা তাদের কবিতা কা'বা ঘরের গায়ে ঝুলিয়ে রাখত। এগুলোকে বলা হতো 'মুয়াল্লাকাত'। আল কুরআনের সুরা ক্বমারের কিছু অংশ নাকি আরবের জাহেলী যুগের কবি ইমরুল কায়েসের এমন একটি কবিতা থেকে নেওয়া (নাউযুবিল্লাহ্)। আর সেই অংশ হচ্ছে সুরা ক্বমারের প্রথম আয়াত :

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ①

অর্থ : "কিয়ামত আসন্ন এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।"[২৬]

এই অভিযোগ যে নির্জলা মিথ্যা তা প্রমাণ করা খুবই সহজ।

প্রথমত : সুরা ক্বমারের এই আয়াতে রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মুজিজার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। এই মুজিজার পরিপ্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। সুরাটির ২ ও ৩ নং আয়াতে মক্কার মুশরিকরা এই মুজিজা দেখেও কীভাবে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল তার বিবরণ উল্লেখিত আছে।[২৭] রাসুলুল্লাহ ﷺ নবুয়ত পেয়েছেন ৪০ বছর বয়সে (৬১০ খ্রিষ্টাব্দ)[২৮] এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মুজিজা ঘটেছে এরও পরে।

অপর দিকে, ইমরুল কায়েস প্রাচীন আরবের একজন কবি। তার মৃত্যু হয়েছে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে,[২৯] রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের প্রায় ৭০ বছর আগে। যে ঘটনা ইমরুল কায়েসের মৃত্যুর ১১০ বছরেরও বেশি সময় পরে ঘটেছে, তার উল্লেখ কি আদৌ তার কবিতায় থাকা সম্ভব? ইমরুল কায়েস কী করে তার মৃত্যুর শত বছর পরে সংঘটিত হওয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিজা নিয়ে কবিতা লিখবে!!!

দ্বিতীয়ত : সে যুগের আরব মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাস করত না।[৩০] ইমরুল কায়েস পৌত্তলিকতা ছেড়ে একত্ববাদী ও পরকালে বিশ্বাসী ইবরাহিমী ধর্ম অনুসরণ করত এমন কোনো বিবরণ নেই। কাজেই ইমরুল কায়েসের কবিতায় পরকালের কথা উল্লেখ থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। কোনোভাবে যদি পরকালের কথা নিয়ে কোনো কবি লিখেও থাকত, তাহলেও পৌত্তলিক আরবরা সেই কবিতা কা'বার গায়ে ঝুলিয়ে রাখতে দিত না। কেননা, এটা ছিল তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা। অথচ সুরা ক্বমারের ১নং আয়াতে বলা হচ্ছে : "কিয়ামত আসন্ন..."। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা প্রাচীন আরবের কোনো মুশরিক কবির লেখা কবিতার অংশ নয়।

এই ভিত্তিহীন ও উদ্ভট অভিযোগের উৎস হচ্ছে, খ্রিষ্টান পণ্ডিত Clair Tisdall এর কিছু বক্তব্য। তিনি ১৯০০ সালে তার গ্রন্থ *The Sources of Islam* এ সুরা ক্বমারের ১ম আয়াতের ব্যাপারে লিখেছেন,

---

[২৬] *আল কুরআন*, ক্বমার, ৫৪ : ১

[২৭] বিস্তারিত দেখুন : *তাফসির ইবন কাসির*, ৮ম খণ্ড (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী), সুরা ক্বমারের ১-৫ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ১৭১-১৭৫

[২৮] *আর রাহিকুল মাখতুম* (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.), পৃষ্ঠা : ৯৪

[২৯] *Encyclopædia Britannica*; Article: 'Imru' al-Qays, Arab poet'
https://www.britannica.com/biography/Imru-al-Qays-Arab-poet

[৩০] *আর রাহিকুল মাখতুম* (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.), পৃষ্ঠা : ১১৪

'It was the custom of the time for and orators to hang up their compositions upon the Ka'aba; and we know the seven Mu'allaqat were exposed. We are told that Fatima, the Prophet's daughter, was one day repeating as she went along the above verse. Just then she met the daughter of Imrul Qays, who cried out, "O that's what your father has taken from one of my father's poems, and calls it something that has come down to him out of heaven;"[৩১]

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) এর মুখে আয়াতটি শুনে ইমরুল কায়েসের কন্যা চিৎকার করে বলেছিল, "ওটা তোমার বাবা [মুহাম্মাদ ﷺ] আমার বাবার কবিতা থেকে নিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) এবং বলে বেড়াচ্ছে তা নাকি আসমান থেকে এসেছে!"

খ্রিষ্টান মিশনারিদের দাবির উৎস হচ্ছে এই লেখা। তারা Clair Tisdall-কে উদ্ধৃত করে কুরআনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলেন। বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদী ব্লগটিতে এ ঘটনার উৎস হিসাবে Ibn Waraq ছদ্মনামের এক ইসলামবিরোধী অপপ্রচারকারীর বইয়ের উদ্ধৃতি দেওয়া আছে, কিন্তু Ibn Waraq এর বইতে উল্লেখিত ঘটনাটিরও মূল উৎস হচ্ছে Clair Tisdall এর ১৯০০ সালে প্রকাশিত সেই গ্রন্থটি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, খোদ Clair Tisdall নিজ জীবদ্দশাতে কুরআনের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগটি থেকে সরে এসেছিলেন এবং পূর্বের বইতে তার নিজের বর্ণনাটিকে 'মিথ্যা ঘটনা' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত তার গ্রন্থ *The Original Sources of the Qur'an* এ তিনি লিখেছেন,

"...I have even heard a story to the effect that one day when Fatimah, Muhammad's daughter, was reciting the verse "The Hour has come near and the Moon has split asunder" (Surah LIV., Al Qamar, 1), a daughter of the poet was present and said to her, "That is a verse from one of my father's poems, and your father has stolen it and pretended that he received it from God." **THE TALE IS PROBABLY FALSE, for Imrau'l Qais died about the year 540 of the Christian era, while Muhammad was not born till A.D. 570, "the year of the Elephant."**

---

[৩১] W. St Clair-Tisdall's book *The Sources of Islam*, being Sir William Muir's translation of Tisdall's Persian work Yanabi`u'l Islam (published in 1900) page 9-10
আরও দেখুন : *The Origin of Islam* (The Origins of the Koran, page 235-236)

In a lithographed edition of the Mu`allaqat, which I obtained in Persia, however, I found at the end of the whole volume certain Odes there attributed to Imrau'l Qais, THOUGH NOT RECOGNIZED AS HIS IN ANY OTHER EDITION OF HIS POEMS WHICH I HAVE SEEN...."[৩২]

অর্থাৎ, ইমরুল কায়েসের মৃত্যুবরণ করেছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মেরও আগে। কাজেই এই ঘটনাটি খুব সম্ভব মিথ্যা। তা ছাড়া তিনি প্রাচীন আরবের 'মুয়াল্লাকাতের' মধ্যে কোথাও ইমরুল কায়েসের এমন কোনো কবিতা পাননি।

যে ঘটনাটিকে মিথ্যা ঘটনা বলে উল্লেখ করে করে খোদ এই ঘটনার বর্ণনাকারী নিজ বইতে ভুল সংশোধন করেছেন, সেই ঘটনাটিকে 'উৎস' ধরে আল কুরআনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা। আল্লাহ এদের মিথ্যাচারের নিপাত করুন। সত্যের বিপরীতে মিথ্যা কোনো কাজে আসে না এবং মিথ্যারোপকারীরা ব্যর্থই হয়।

Clair Tisdall তো তার ভুল সংশোধন করেছিলেন। এ দেশের তথাকথিত মুক্তমনারা কি তাদের ভুল সংশোধন করবেন নাকি বাধা পড়ে থাকবেন মিথ্যার শৃঙ্খলে?

"কিন্তু আমি [আল্লাহ] সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার ওপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য।"[৩৩]

"নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) এক সম্মানিত রাসুলের তেলাওয়াত। এটা কোনো কবির কথা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস করো। এটা কোনো গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।"[৩৪]

"আমি তাঁকে [মুহাম্মাদ ﷺ] কবিতা শিক্ষা দিইনি এবং সেটি তো তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। যাতে তিনি সতর্ক করেন যারা জীবিত তাদের এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।"[৩৫]

---

[৩২] *The Original Sources of the Qur'an* by W. St Clair-Tisdall, published by SPCK, London, 1905; page: 47-49

[৩৩] *আল কুরআন*, আম্বিয়া, ২১ : ১৮

[৩৪] *আল কুরআন*, হাক্কাহ, ৬৯ : ৪০-৪৩

[৩৫] *আল কুরআন*, ইয়াসিন, ৩৬ : ৬৯-৭০

আল্লাহ কেন শয়তান সৃষ্টি করলেন?

নাস্তিক প্রশ্ন : শয়তান নাকি মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে। স্রষ্টা কেন তাহলে নিজ সৃষ্ট জীব মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানকে সৃষ্টি করলেন? এটা একজন স্রষ্টার জন্য কতটুকু নৈতিক?

উত্তর : শয়তানকে বলা হয়েছে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। যার কারণে বহু আদম সন্তানের পদস্খলন ঘটেছে। বনী ইসরাঈলের বিখ্যাত আবেদ বারসিসার কথা কে না জানে? যাকে শয়তান এক মেয়ের সাথে কথা বলতে প্ররোচিত করেছিল। তারপর জিনা, খুন, শিরক—কী করায়নি শয়তান বারসিসাকে দিয়ে?[৩৬] শুধু বারসিসা নয়, এ পৃথিবীর বহু মানুষকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে। কাজেই সংশয়ী মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হলো? আল্লাহ তা'আলা কেন এমন একজনকে সৃষ্টি করলেন যার দ্বারা তাঁর বান্দারা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে? উত্তরটা জানার আগে শয়তান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

আরবি 'শয়তান' (شيطان) শব্দটির অর্থ : বিদ্রোহী বা অবাধ্য (rebellious)।[৩৭]

আল্লাহ বলেন :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

---

[৩৬] *ইবন কাসির*, ১৩/৪৯৭; *তাবারী*, ২৮/৪৯-৫০

[৩৭] "Why Satan was named Iblees (Islam web)" https://goo.gl/FVpVh4

অর্থ : আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদের, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদের ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ করো।[৩৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় *তাফসির ইবন কাসিরে* উল্লেখ আছে,

কাতাদা (র.) বলেন, "জিনদের মধ্যেও শয়তান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে।"[৩৯]

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া (র.) বলেন :

"শয়তান হচ্ছে, মানুষ এবং জিনের মধ্যে বিদ্রোহী ও অবাধ্যরা। আর এ জিনেরা ইবলিসের বংশধর।"[৪০]

অতএব আমরা জানলাম যে 'শয়তান' হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম। মানুষ কিংবা জিন জাতির মধ্যে আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নাম এটি। অভিযোগকারী নাস্তিক-মুক্তমনারা ইবলিস ও তার বংশধর জিন-শয়তানদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে, যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের প্রশ্ন, স্রষ্টা বলে যদি কেউ থেকেই থাকেন, তাহলে তিনি কেন এমন কিছুকে সৃষ্টি করবেন যারা তাঁর নিজ সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামী করবে?

প্রথমত : আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে, 'শয়তান' একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যগত নাম। কেউই 'শয়তান' হয়ে জন্মে না; বরং নিজ কর্মের দ্বারা সে 'শয়তান' হয়। ইবলিস এবং তার উত্তরসূরিদের আল্লাহ্ জোর করে 'শয়তান' বানাননি; বরং তারা নিজ কর্ম দ্বারা শয়তান হয়েছে। জিন এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে। তারা ভালো-মন্দ কর্ম বেছে নিতে পারে। ইবলিস ও তার উত্তরসূরিরা নিজেরাই 'শয়তান' হওয়ার ও মানুষকে কুমন্ত্রণা দেবার পথ বেছে নিয়েছে।[৪১]

দ্বিতীয়ত : জগতের প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে হয়। আল্লাহ

---

[৩৮] *আল কুরআন*, আন'আম ৬ : ১১২

[৩৯] *তাফসির ইবন কাসির*, ৩য় খণ্ড (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী), সুরা মায়িদাহর ১১২ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ১৬৮-১৬৯

[৪০] "Why Satan was named Iblees (Islam web)"
https://goo.gl/FVpVh4

[৪১] "Free Will of Iblis and His Keenness to Lead People Astray" (IslamQa -Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/20105

মানুষ ও জিনকে ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। তাদের দ্বারা ভালো ও খারাপ কর্ম আল্লাহ সম্পাদন হতে দেন। তাদের ভালো কর্মের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। যেহেতু মানুষের সকল কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি, কাজেই ভালো কর্মের সাথে সাথে পাপও আল্লাহর 'ইচ্ছা'ক্রমে হয়। তবে তা কেবল এ অর্থে যে আল্লাহ এগুলো (পাপ/খারাপ কর্ম) নির্ধারিত করেছেন; এ অর্থে নয় যে আল্লাহ এগুলো অনুমোদন করেন বা আদেশ দেন। পৃথিবীতে যত খারাপ কাজ বা অপরাধ সংঘটিত হয়, এগুলোর ওপর আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তুষ্টি নেই। আল্লাহ এগুলো ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন এবং এগুলো থেকে বিরত হবার আদেশ দেন।[৪২]

তৃতীয়ত : আল্লাহ কেন শয়তানকে সৃষ্টি করলেন ও খারাপ পথে যেতে দিলেন?

ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ (র.) তাঁর *শিফাউল 'আলিল* গ্রন্থে শয়তান সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তা'আলার বেশ কিছু হিকমতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, ইবলিস ও তার বাহিনীর সৃষ্টির পেছনে এত হিকমত রয়েছে, যার বিস্তারিত আল্লাহ ছাড়া কেউই অনুধাবন করতে পারবে না। এর মধ্যে অল্প কিছু হিকমতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে,

১. শয়তান ও তার শিষ্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের ইবাদতের উৎকর্ষের দিকে ধাবিত করে। নবীগণ এবং আল্লাহর বান্দারা শয়তান ও তার শিষ্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই ইবাদতকে চূড়ান্ত উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছেন। আল্লাহর নিকট শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং শয়তান থেকে বাঁচার জন্য বার বার আল্লাহর নিকট ফিরে আসার মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের ঈমানকে পাকাপোক্ত করেছেন। শয়তান না থাকলে তো ইবাদতের এই সুউচ্চ অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব হতো না।

২. শয়তানের জন্যই আল্লাহর বান্দারা তাদের পাপের জন্য ভীত হয়। কারণ, তারা তো জানে পাপের কারণে শয়তানের (ইবলিস) কী দশা হয়েছে। পাপের কারণেই ইবলিস ফেরেশতাদের সাহচর্য থেকে নেমে গেছে ও বিতাড়িত হয়ে গেছে—এই ঘটনা থেকে একজন মুমিন শিক্ষা নেয়। ফলে তাঁর তাকওয়া (আল্লাহভীতি) বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয়।

৩. মানুষ ও (শয়তান) জিন উভয়েরই আদি পিতাকে ভুল [বড় বা ছোট গুনাহ] দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর বিধানের বাইরে যায়, তাঁর ইবাদতে অহংকার ও অবাধ্যতা করে, তাদের জন্য আল্লাহ একজন আদি পিতা [শয়তান

---

[৪২] *শারহ আকিদা আত ত্বহাওয়ী*, ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী (র.); পৃষ্ঠা : ৩৮ (ইংরেজি অনুবাদ)

জিনদের] ইবলিসকে একটি নিদর্শন বানিয়েছেন। আর যারা পাপ করলে অনুশোচনা করে আর তাঁর প্রভুর নিকট ফিরে যায়, তাঁদের জন্য আল্লাহ অন্য আদি পিতাকে [আদম (আ.)] একটি নিদর্শন বানিয়েছেন।

৪. শয়তান আল্লাহর বান্দাদের জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ।

৫. ইবলিস শয়তান হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিক্ষমতার একটি নিদর্শন। আল্লাহ যে বিপরীতধর্মী সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন, শয়তান তার একটি প্রমাণ। যেমন : তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন, আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, পানি ও আগুন সৃষ্টি করেছেন, ঠান্ডা ও গরম সৃষ্টি করেছেন, ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন। তেমনি জিবরীল (আ.) ও ফেরেশতাদের বিপরীতে ইবলিস ও শয়তানদের সৃষ্টি করেছেন।

৬. কোনো কিছুর পূর্ণ মাহাত্ম্য বোঝা যায় এর বিপরীতধর্মী কোনো কিছুর মাধ্যমে। যদি কুৎসিত কিছু না থাকত, তাহলে আমরা কখনো সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বুঝতে পারতাম না। যদি দারিদ্র্য না থাকত, তাহলে আমরা সম্পদশালী হওয়াকে মূল্য দিতাম না।

৭. আল্লাহ বান্দাদের নিকট তাঁর সংযম, ধৈর্য, সহনশীলতা, পরম দয়া ও ঔদার্যের প্রকাশ ঘটাতে পছন্দ করেন। আর এ জন্য এমনটি ঘটা প্রয়োজন যে, তিনি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা তাঁর সাথে শরিক করবে ও তাঁকে ক্রুদ্ধ করবে। এরপরেও তিনি তাদের সর্বপ্রকার নিআমত ভোগ করতে দেবেন। তিনি জীবিকা দেবেন, সুস্বাস্থ্য দেবেন এবং সকল প্রকার বিলাসিতা উপভোগ করতে দেবেন, তিনি তাদের ইচ্ছা শুনবেন ও তাদের থেকে অনিষ্ট সরিয়ে নেবেন। তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে, তাঁর সাথে শরিক স্থাপন করে, তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করে যে খারাপ আচরণ করবে, এর বিপরীতে তিনি তাদের প্রতি দয়া ও সদাচরণ করবেন। একটি সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে, 'সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! যদি তোমরা পাপ না করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে [তোমাদের পরিবর্তে] এমন এক জাতি আনয়ন করবেন, যারা পাপ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন।'[৪৩]

৮. আল্লাহর পছন্দনীয় অনেক কিছুই শয়তানের অস্তিত্বের জন্য সংঘটিত হতে পারে। যেমন : কারও নিজ কামনা-বাসনার বাইরে যাওয়া (শয়তানের দ্বারাই যা

---

[৪৩] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ২৭৪৯; *তিরমিযী*, হাদিস নং : ২৫২৬; *মুসনাদ আহমাদ*, হাদিস নং : ৭৯৮৩, ৮০২১

জাগ্রত হয় এবং বান্দা তা দমন করা সুযোগ পায়), কারও কষ্ট ও প্রতিকূলতার মধ্যে পতিত হওয়া যার দ্বারা সেই বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কেউ তার প্রেমাস্পদের কাছ থেকে সব থেকে প্রিয় যা আশা করতে পারে তা হচ্ছে, সে শুধু তারই ভালোবাসার প্রমাণ দেবার জন্য চরম কষ্ট ও প্রতিকূলতা সহ্য করছে। যদিও পাপ ও অবাধ্যতা ইবলিসের কুমন্ত্রণার কারণে হয় এবং তা আল্লাহর ক্রোধ তৈরি করে, কিন্তু এরচেয়েও আল্লাহ্ অনেক বেশি সন্তুষ্ট হন যদি তাঁর বান্দা তাওবা করে। তিনি এর ফলে ওই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যে, ভয়ংকর মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে ফেলবার পর তা আবার খুঁজে পায়, যে উটের পিঠে ছিল তার বেঁচে থাকবার অবলম্বন খাদ্য ও পানীয়।[৪৪]

… … …[৪৫]

শয়তান মানুষকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দেয়, যা মানুষের বিপথগামী হবার জন্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের ওপর শয়তানের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে সে বান্দাদের খারাপ কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। সে শুধু মানুষকে কুমন্ত্রণাই দিতে পারে। যারা শয়তানের কুমন্ত্রণার অনুসরণ করে, শয়তানের পথে চলে, তারা পথভ্রষ্ট হয়।[৪৬] এটুকু ক্ষমতাই কেবল শয়তানের আছে। *কুরআনে* বলা হয়েছে :

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার [শয়তানের] অনুসরণ করবে

---

[৪৪] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা যখন আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তিনি ওই ব্যক্তি থেকেও অধিক খুশি হন যে মরু-বিয়াবানে নিজ সাওয়ারির ওপর আরোহিত ছিল। তারপর সাওয়ারিটি তার থেকে পালিয়ে গেল। আর তার ওপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি বৃক্ষের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ে এবং তার সাওয়ারি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সাওয়ারিটি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন (অমনিই) সে তার লাগাম ধরে ফেলে। তারপর সে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, "হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব।" আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলেছে!
[*সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ৬৭০৮; লিঙ্ক : https://goo.gl/Gc৫ce৯]

[৪৫] সংক্ষিপ্তসার হিসাবে উপস্থাপিত; মূল উৎস : *শিফাউল 'আলিল*, ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ (র.), পৃষ্ঠা : ৩২২;

■ সূত্র : "Why did Allah create Satan (Shaytan)" -Khilafat World
http://www.khilafatworld.com/2011/12/why-did-allah-create-satan-shaytan.html
■ আরও দেখুন : "The rationale behind the creation of Satan - Islam web - English"
https://goo.gl/mxuXLQ
■ *আলামুল জিন্নি ওয়াশ শাইত্বন*, উমার সুলাইমান আল আশকার, পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৭৩

[৪৬] এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, শয়তানকে কে কুমন্ত্রণা দেয়? এর উত্তর হচ্ছে : সেই নিজেই নিজ কুপ্রবৃত্তির দ্বারা খারাপ কাজ করে। কেউ কাউকে কুমন্ত্রণা দিয়ে কোনো কাজ করাতে বাধ্য করতে পারে না। মানুষ ও জিন উভয়ই মূলত নিজ প্রবৃত্তির দ্বারা খারাপ কাজ করে। যার কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়।

তারা ছাড়া আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।"[৪৭]

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

অর্থ : "তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে : তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।"[৪৮]

যারা শয়তানের পথে চলে না, আল্লাহর শরণ নেয়, শয়তান তাদের ওপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারে না।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : "যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করো, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৪৯]

কাজেই আমরা বলতে পারি, শয়তান নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা খারাপ পথ বেছে নিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে এর নির্দেশ দেননি। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শয়তান থেকে সতর্ক করেছেন। শয়তানের সৃষ্টিও আল্লাহর অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক ও এর মাঝে অনেক হিকমত নিহিত আছে। আল্লাহ্ তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ পৃথিবীর জীবনকে মানুষের জন্য করেছেন পরীক্ষাস্বরূপ।[৫০] শয়তানের অস্তিত্বের দ্বারা মানুষের জন্য এই পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়। আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম এভাবেই অসামান্য এক ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। কাজেই শয়তানের ধারণার কারণে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বা নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা অযৌক্তিক।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝٥
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝٦

অর্থ : হে মানুষ, অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন

---

[৪৭] *আল কুরআন*, হিজর, ১৫ : ৪২-৪৩

[৪৮] *আল কুরআন*, হাশর, ৫৯ : ১৬

[৪৯] *আল কুরআন*, আ'রাফ, ৭ : ২০০

[৫০] সুরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬ ও সুরা মুলক, ৬৭ : ২ দ্রষ্টব্য

যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক [শয়তান] যেন কিছুতেই তোমাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য করো। সে তার দলকে কেবল এ জন্যই ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।[৫১]

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

অর্থ : হে আদম-সন্তানেরা, আমি কি তোমাদের এ মর্মে নির্দেশ দিইনি যে, "তোমরা শয়তানের দাসত্ব কোরো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদাত করো, এটাই সরল পথ? শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বোঝোনি?"[৫২]

---

[৫১] *আল কুরআন*, ফাতির, ৩৫ : ৫-৬

[৫২] *আল কুরআন*, ইয়াসিন, ৩৬ : ৬০-৬২

সড়কে নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ মূলনীতি এবং "মুক্তির রাস্তা"

বহুল সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশ ও সমাজ। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে অনিয়ম দুরাচারেরই একটা খণ্ডাংশ হচ্ছে সড়কপথে চলমান নৈরাজ্য। মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে, সড়কপথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু এখন 'স্বাভাবিক' মৃত্যু হয়ে গেছে। পদে পদে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্বৃত্তায়ন এখন দেঁতো হাসি হয়ে মানুষের চোখে ধরা দিচ্ছে। ছাত্রসমাজকে এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও নামতে দেখা গিয়েছে। দেশের মানুষ এসব নৈরাজ্য থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু এই মুক্তির সর্বোত্তম উপায় কী?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল দিকেই এর দিকনির্দেশনা রয়েছে। সড়কের আদব ও নিরাপত্তার ব্যাপারেও ইসলামী শরিয়তে সুনির্দিষ্ট হুকুম-আহকাম পাওয়া যায়। সড়ক-সম্পর্কিত হাদিসগুলোর মধ্যে এসব হুকুমের মূলনীতি নিহিত রয়েছে।

আমাদের দেশে রাস্তা দখল করার প্রতিযোগিতা এক নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র। এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি কী?

> রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "খবরদার, তোমরা রাস্তার ধারে বোসো না। আর একান্ত যদি বসতেই হয়, তাহলে তার হক আদায় কোরো।"
>
> লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, "রাস্তার হক কী, হে আল্লাহর রাসুল?"
>
> তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা,

সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।"[৫৩]

রাস্তার ধারে বসতে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা আমরা একটি মূলনীতি পেয়ে যাচ্ছি। রাস্তা দখল করা এক অনুচিত কাজ। সেই সাথে কাউকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়াও ঠিক নয়।

রাস্তায় কষ্টদায়ক যেকোনো প্রকার জিনিস অপসারণ করা ইসলামে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক কর্ম। কর্মটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে একে ঈমানের শাখার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

> রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের শাখা ৭০টিরও কিছু বেশি। ... এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে "আল্লাহ ব্যতীত সত্য উপাস্য নেই" [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।[৫৪]
>
> আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ, আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যার দ্বারা উপকৃত হতে পারি।
>
> তিনি বললেন : মুসলিমদের যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেবে।[৫৫]
>
> ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আদম-সন্তানের দেহে ৩৬০টি সংযোগ অস্থি বা গ্রন্থি (joints) আছে। প্রতিদিন সেগুলোর প্রতিটির জন্য একটি সদাকাহ (দান) ধার্য আছে। প্রতিটি উত্তম কথা একটি সদাকাহ। কোনো ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করাও একটি সদাকাহ। কেউ কাউকে পানি পান করালে তাও একটি সদাকাহ;
>
> এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও একটি সদাকাহ।[৫৬]
>
> বুরাইদাহ (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "মানুষের শরীরে ৩৬০টি গ্রন্থি রয়েছে। তার প্রতিটি জোড়ার জন্য সদাকাহ করা উচিত।" লোকজন বলল, "কেউ কি এত সদাকাহ করতে সক্ষম, হে আল্লাহর নবী!"
>
> তিনি বললেন : "তুমি মাসজিদের শ্লেষ্মা (মাটিতে) পুঁতে দেবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তুমি যদি তাও না পার, তাহলে দুহার

---

[৫৩] *মুসনাদ আহমাদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, সহীহুল জামে*, হাদিস নং : ২৬৭৫

[৫৪] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ৬০

[৫৫] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ৬৪৩৫

[৫৬] *বাযযার, ইবন হিব্বান, আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং : ৪২৩ (সহীহ)

(চাশত) সময় দুই রাকআত সলাত আদায় করবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।”[৫৭]

নবী ﷺ বলেন : “আদম-সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের ওপর সদাকাহ্ ওয়াজিব করে। কারও সাক্ষাতে তাকে সালাম দেওয়া একটি সদাকাহ। সৎ কাজের আদেশ একটি সদাকাহ, অন্যায় হতে নিষেধ করা একটি সদাকাহ।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা একটি সদাকাহ। পরিবার-পরিজনের দায়-দায়িত্ব বহন করা একটি সদাকাহ।...”[৫৮]

ওপরের প্রতিটি হাদিসে কমন বিষয় হিসাবে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর কথা উল্লেখ রয়েছে।

রাস্তা থেকে যেকোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তথা কষ্টদায়ক জিনিস সরানো ইসলামে এমন একটি কাজ, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন সে রাস্তার ওপর একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তার এই ভালো কাজটি পছন্দ করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[৫৯]

ওপরের প্রতিটি হাদিস সহীহ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও ফযিলতের কাজ, বিপরীতক্রমে বলা যায়, রাস্তায় যেকোনো প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করা এক মহা অন্যায় কাজ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো যেমন ঈমানের শাখার একটি, বিপরীতক্রমে বলা যায় রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু সৃষ্টি করা ঈমানের বিরোধী কাজ।

হাদিসের এই মূলনীতি অনুসরণ করলে আমাদের দেশের সড়কগুলোর অবস্থা কতই-না উত্তম হতো![৬০]

কারও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, উদাসীনতা, অসাবধানতা, অসাধুতা ইত্যাদির জন্য যদি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি হয়, তাহলে ইসলামে সেটি মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত

---

[৫৭] *মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবু দাউদ* (তাহকিককৃত), হাদিস নং : ৫২৪২

[৫৮] *সহীহ মুসলিম, ইবন খুজাইমাহ* হাদিস নং : ১২২৫, *সুনান আবু দাউদ* (তাহকিককৃত) হাদিস নং : ১২৮৫

[৫৯] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ৬৪৩১

[৬০] এ ব্যাপারে প্রখ্যাত আলেম শায়খ আহমাদুল্লাহর এই আলোচনাটি শোনা যেতে পারে : https://bit.ly/2Oax7yr

হয়। এটি ইসলামে "ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড" হিসাবে চিহ্নিত হয়। যাদের কারণে এই প্রাণহানি, তাদের এর দায় বহন করতে হয়। সঠিকভাবে প্রস্তুত না হয়ে লাইসেন্স ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো, ভুল লেন দিয়ে গাড়ি চালানো, গাড়ির ত্রুটি মেরামতে অবহেলা করা, ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করা—এই কাজগুলোর ফলে মূলত দুর্ঘটনা ঘটে। আর এগুলো নিঃসন্দেহে চালক বা বাস-মালিককে অপরাধী হিসাবে গণ্য করার জন্য যথেষ্ট। যে পক্ষ এ জন্য যে পরিমাণে দায়ী, তাকে ঠিক সে পরিমাণ দায় বহন করতে হয়।[৬১]

ইসলামী বিধান অনুযায়ী এ অপরাধের শাস্তি হত্যাকাণ্ডের শাস্তির সদৃশ হয়। যাদের কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটবে, তাদের এ জন্য নিহতের পরিবারকে রক্তমূল্য (দিয়াত) পরিশোধ করতে হবে। সেই সাথে গুনাহ থেকে মুক্ত হবার জন্য ওই ব্যক্তিকে একজন মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে। তা সম্ভব না হলে টানা ২ মাস সিয়াম (রোজা) পালন করতে হবে।[৬২] ইসলামী আইনে এই রক্তমূল্যের পরিমাণ ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা অথবা ১২,০০০ রৌপ্যমুদ্রা অথবা ১০০টি উটের মূল্য।[৬৩]

এই ইসলামী আইন প্রয়োগের একটি বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করছি। সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ইসলামি আইন কার্যকর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চালককে দিতে হয় মোটা অঙ্কের জরিমানা। সৌদি আরবে এ আইনের কার্যকারিতার বিষয়ে জানিয়েছেন সৌদি প্রবাসী ও দাঈ শায়খ আহমাদুল্লাহ। তিনি বলেন, বাস-চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো নতুন কিছু নয়। চালকের উপযুক্ত বিচার কখনোই হয় না। এভাবে চলতে থাকলে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ হওয়ার আশা করাও অন্যায্য। সৌদিতে গাড়ি চাপায় কেউ মারা গেলে সেটাকে হত্যাকাণ্ড ধরা হয়। ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী 'ক্বাতলে খাতা' বা ভুলবশত হত্যার বিচার হলো, চালককে প্রতিজন নিহতের পরিবারকে এক শ উটের মূল্য (৩ লক্ষ সৌদি রিয়াল বা ৬২ লক্ষ টাকা)

---

[৬১] ▪ "Two cars collided and three people died. What does he have to do" – islamqa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/46720
▪ "Does he have to offer expiation for accidental killing if he struck them with his car and his wife died" – islamqa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/52918

[৬২] এর বিস্তারিত পদ্ধতি ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন :
"In the event of manslaughter, the diyah is required from the killer's family and expiation is required from the killer" – islamqa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/52809

[৬৩] What to do if a person has killed someone accidently (Islam web)
https://bit.ly/2MjHnnQ

ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই টাকা শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তিই দেয় না। তার পরিবার, বংশ ও নিকটজনদেরও এর ভার বহন করতে হয়। আদায় না করা পর্যন্ত জেলে থাকার কোনো বিকল্প নাই। যত বড় প্রভাবশালীই হোক না কেন, কখনো এর ব্যত্যয় ঘটে না। সে জন্য গাড়ি চাপা দিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা সৌদিতে বিরল।[৬৪]

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কী করা যায় সে বিষয়ে বলেছেন মালয়েশিয়ার গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক ফাইন্যান্সে (ইনসিএফ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে পিএইচডিরত প্রখ্যাত আলেম মুফতি ইউসুফ সুলতান। তিনি জানিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আল কুরআনের নির্দেশনাকে মেনে চলতে হবে। ইসলাম সকল ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ না দিলেই ফাসাদ তৈরি হয়। আর কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় ফাসাদ সৃষ্টি হয় এমন সকল কাজ থেকে বারণ করা হয়েছে।

'লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভার বা ফিটনেসবিহীন গাড়ি এগুলো সবই ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। এই ফাসাদের চর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে।" তিনি বলেন, ভালো ড্রাইভার মানে শুধু ভালোভাবে গাড়ি চালানোই নয়। ভালো ড্রাইভার মানে যিনি অন্যান্য গাড়ি চালকদের সহকর্মীর মতো মনে করে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে গাড়ি চালাবেন। এটাকে রেসপন্সিবেল ড্রাইভিং তথা দায়িত্বশীল ড্রাইভিং বা সেইভ ড্রাইভিং তথা নিরাপদ ড্রাইভিং বলে। এ বিষয়গুলো আমাদের ড্রাইভারদের লক্ষ রাখতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার জায়গাটা তৈরি করতে হবে। এগুলোর পরই ড্রাইভারদের ভুল ও শাস্তির ব্যাপারটি নির্ধারিত হবে। অবস্থাভেদে তাদের জন্য বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত হবে। তবে রাষ্ট্রকে অবশ্যই এসব শাস্তি বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করতে হবে।

তবে এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক ফতোয়া রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামিক ফাইনান্স একাডেমি ও কনসালটেন্সি এর সমন্বয়ক মুফতি আবু সাঈদ যোবায়ের। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা ওআইসি কর্তৃক পরিচালিত ইসলামি ইত্তেফাক ফোরাম (ইসলামি ফেকাহ একাডেমি জেদ্দা) ৯০ এর দশকে এ বিষয়ে একটি রেজুলেশন করে রেখেছে। সেখানে তারা ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সড়ক দুর্ঘটনার শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ কী হবে, এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ফতোয়া দিয়েছেন। রেজুলেশনের সারমর্ম হচ্ছে, যিনি সরাসরি এ অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাকে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুবাশির বলা হয়। মুবাশির ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ

---

[৬৪] "ইসলামী আইনেই ঠেকানো যেতে পারে সড়ক দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞদের মতামত Fateh24" https://fateh24.com/thekhano-jabe/

দিতে বাধ্য থাকবেন, তিনি বিচারের মুখোমুখি হবেন ও রাষ্ট্র তার থেকে এ ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে এবং এ অর্থ আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা তার পরিবারকে হস্তান্তর করবে।[৬৫]

যদি কোনোভাবে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে এই দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে ইসলামের হুকুম হচ্ছে, সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে ইন শা আল্লাহ।[৬৬] এটি মৃত ব্যক্তিটির প্রতি আল্লাহর রহমত এবং মৃতের পরিবারের জন্য একটি বিশাল সান্ত্বনার ব্যাপার। ২০১৬ সালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় দেশবরেণ্য আলেম খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র.) মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন।

সমাজে কোনো অন্যায় ও অসংগতি দেখলে এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশ রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ''তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখে তবে সে তার হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তবে সে তার অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এ ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।''[৬৭]

কাজেই একটি দেশের যেকোনো পর্যায়ে অন্যায় ও নৈরাজ্য দেখা দিলে তা নিরসনে সাধ্যমতো চেষ্টা করা মুসলিমদের জন্য কর্তব্য। আমাদের দেশের কিশোর ছাত্রসমাজ বর্তমানে খুবই যৌক্তিক কারণে আন্দোলন করছেন। সড়কপথের নৈরাজ্যগুলো দূর করার জন্য রাজপথে নেমেছেন।[৬৮] তবে এই প্রচেষ্টাগুলো যেন যথাযথভাবে হয়। প্রতিবাদ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জালিমের বিরুদ্ধে। এ জন্য যেন পথচারী ও সাধারণ জনগণের অধিকার নষ্ট না হয়। তাদের জীবন ও সম্পদের কোনো ক্ষতি না হয়। দেশে যেন কোনো প্রকার নাশকতা ও ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না। নিরাপদ সড়কের আন্দোলনও যেন নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়। আন্দোলনের জন্য রাজপথে দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের কারণে কারও যেন

---

[৬৫] ▪ প্রাগুক্ত
▪ এ প্রসঙ্গে শায়খ আহমাদুল্লাহর এই আলোচনাটি দেখা যেতে পারে : https://bit.ly/2n7zo25

[৬৬] ▪ Is the one who dies in a car accident a martyr (shaheed) – islamqa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/148735
▪ "A Muslim who is killed unjustly is considered a martyr (Islam web)"
https://bit.ly/2LQXAVd

[৬৭] *সহীহ মুসলিম*, ১/৬৯

[৬৮] লেখাটির প্রেক্ষাপট ২০১৮ সালের কিশোর ছাত্র সমাজের "নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন"।
https://bn.wikipedia.org/wiki/২০১৮-র_নিরাপদ_সড়ক_চাই_আন্দোলন

সলাত (নামাজ) বিনষ্ট না হয়। ছাত্রী বোনেরা যেন ফরয পর্দা লঙ্ঘন না করেন। ভালো কাজ করতে গিয়ে যেন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

সর্বোপরি আমাদের এটা অনুধাবন করা জরুরি যে, কুরআন-সুন্নাহর মাঝেই আছে আমাদের জীবনের সকল দিকের সর্বোত্তম বিধান। আল্লাহ তা'আলার বিধানের মাঝেই আছে সড়কসহ অন্য সকল স্থানের সকল সমস্যার সমাধান। এর মাঝেই আছে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। এটিই আমাদের "মুক্তির রাস্তা"।

পার্থিব জীবনে নিরাপদ সড়ক আমাদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। তবে আমাদের মূল গন্তব্য তো জান্নাত। সেই জান্নাতে যাবার জন্য মুক্তির মহাসড়কে ওঠা সবচেয়ে জরুরি। আল্লাহ আমাদের "মুক্তির রাস্তা"-এর দিকে ধাবিত করুন। নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। ইহকাল ও পরকালের সকল দুর্ঘটনা থেকে হিফাযত করুন।

কা'বা ও আল-আকসা নির্মাণের সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে হাদিসের তথ্য কতটুকু সঠিক?

নাস্তিক প্রশ্ন : হাদিস বলে, মসজিদুল হারাম আর আল-আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) এর মাঝে ব্যবধান ৪০ বছর।

কুরআন বলে, মসজিদুল হারাম (কা'বা) এর নির্মাতা নবী ইবরাহিম (Abraham - 1812-1637 BC)।

অথচ Temple Mount (বাইতুল মুকাদ্দাস) (958-951 BC) প্রতিষ্ঠা করেন নবী সুলাইমান (King Solomon - 970-930 BC)। ইবরাহিম ও সুলাইমানের মাঝে প্রায় হাজার বছরের ব্যবধান। এটা কি কুরআন ও হাদিসের তথ্যের অসংগতি নয়?

উত্তর : আল-আকসা আমাদের প্রথম কিবলা। আর কা'বা আমাদের বর্তমান কিবলা। দুইটি মসজিদই ইসলামে সম্মানিত স্থান। বহু নবীর স্মৃতিধন্য এ মসজিদ দুটি। আল কুরআনে কা'বা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

> অর্থ : নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় (মক্কা) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।"[৬১]

---

[৬১] *আল কুরআন*, আলি ইমরান, ৩ : ৯৬

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ : আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল (কা'বা) ঘরের ভিতগুলো উঠাচ্ছিল (এবং বলছিল,) 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'[৭০]

এবার দেখা যাক, সে হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, কা'বা ও আল-আকসার মধ্যে ব্যবধান ছিল চল্লিশ বছর।

আবু যার গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বপ্রথম কোনো মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন : মসজিদুল হারাম। আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন : তারপর মসজিদুল আকসা। **আমি বললাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন : চল্লিশ বছরের।** যেখানেই তোমার সলাতের ওয়াক্ত হয়, সেখানেই তুমি সলাত আদায় করতে পার; কেননা, এখন তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ।[৭১]

কুরআনের বিবরণ দ্বারা এটা স্পষ্ট যে কা'বা নির্মাণ করেছেন ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)। সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আল-আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) মসজিদের উৎপত্তি। নাস্তিক-মুক্তমনা ও খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকদের দাবি হচ্ছে : Temple Mount (আল-আকসা) নির্মাণ করেন সুলাইমান (আ.)। অথচ তাঁর ও ইবরাহিম (আ.) এর মাঝে প্রায় হাজার বছরের ব্যবধান। কাজেই হাদিসে উল্লেখিত "কা'বা ও আল-আকসার মধ্যে ব্যবধান ৪০ বছরের" এই তথ্য সত্য হতে পারে না (নাউযুবিল্লাহ)।

হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেন :

"এ হাদিসটি তাদের জন্য বোঝা কষ্টকর, যারা এতে কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা জানে না। কেউ হয়তো বলতে পারে : "এ তো সবাই জানে যে নবী সুলাইমান বিন দাউদ (আ.) মসজিদুল আকসা নির্মাণ করেন এবং তাঁর ও ইবরাহিম (আ.) এর মধ্যে হাজার বছরের ব্যবধান।"

এর দ্বারা এমন ব্যক্তির অজ্ঞতা বোঝা যায়। **কেননা, সুলাইমান (আ.) তো শুধু আল-আকসা পুনর্নির্মাণ ও নতুন রূপ দান করেছেন। তিনি মোটেও**

---

[৭০] *আল কুরআন*, বাকারাহ, ২ : ১২৭

[৭১] *সহীহ বুখারী*, হাদিস নং : ৬৩৬, *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ৫২০, *সুনান ইবন মাজাহ*, হাদিস নং : ৭৫৩

সর্বপ্রথম এটি প্রতিষ্ঠা করেননি বা নির্মাণ করেননি; বরং যিনি প্রকৃতপক্ষে এটি (সর্বপ্রথম) নির্মাণ করেন, তিনি হচ্ছেন ইয়া'কুব বিন ইসহাক (আ.)। এবং এটি ছিল মক্কায় ইবরাহিম (আ.) এর কা'বা নির্মাণের পরবর্তীকালে।"[৭২]

অর্থাৎ নবী ইয়া'কুব (আ.) হচ্ছেন আল-আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) মসজিদের সর্বপ্রথম গোড়াপত্তনকারী। তিনি ছিলেন নবী ইবরাহিম (আ.) এর নাতি। দাদা ও নাতির কাজের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান থাকা খুবই সম্ভব। কাজেই হাদিসে কা'বা ও আল-আকসার মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধানের তথ্যের সঙ্গে এই তথ্য পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

চলুন দেখি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ এ ব্যাপারে কী বলে।

"এদিকে যাকোব [ইয়া'কুব (আ.)] বের-শেবা ছেড়ে হারন শহরের দিকে যাত্রা করলেন। পথে এক জায়গায় বেলা ডুবে গেলে তিনি সেখানেই রাতটা কাটালেন। সেখানে কতগুলো পাথর পড়ে ছিল। যাকোব সেগুলোর একটা মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তিনি স্বপ্নে দেখলেন মাটির ওপরে একটা সিঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবং তার মাথাটা গিয়ে স্বর্গে ঠেকেছে। তিনি দেখলেন ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা (ফেরেশতা) তার ওপর দিয়ে উঠা-নামা করছেন, আর সদাপ্রভু ঈশ্বর তার ওপরে দাঁড়িয়ে বলছেন, "আমি সদাপ্রভু। আমি তোমার পূর্বপুরুষ আব্রাহামের [ইবরাহিম (আ.)] ঈশ্বর এবং ইসহাকেরও ঈশ্বর। তুমি যেখানে শুয়ে আছ সেই দেশ আমি তোমাকে এবং তোমার বংশের লোকদের দেব। তোমার বংশের লোকেরা দুনিয়ার ধূলিকণার মতো অসংখ্য হবে। পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে তোমার বংশ ছড়িয়ে পড়বে। দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ও তোমার বংশের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ পাবে।

আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; তুমি যেখানেই যাও না কেন আমি তোমাকে রক্ষা করব। এই দেশেই আবার আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আমি তোমাকে যা বলেছি তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

পরে যাকোব ঘুম থেকে উঠে বললেন, "তাহলে সদাপ্রভু নিশ্চয়ই এই জায়গায় আছেন অথচ আমি তা বুঝতে পারিনি।"এই কথা ভেবে তাঁর মনে ভয় হলো। তিনি বললেন, **"কী অসাধারণ এই জায়গা! এটা ঈশ্বরের ঘর ছাড়া আর কিছু নয়; স্বর্গের দরজা এখানেই।"**

---

[৭২] *যাদুল মা'আদ*, ১/৫০

যাকোব খুব ভোরে উঠলেন এবং যে পাথরটা তিনি মাথার নিচে দিয়েছিলেন সেটা থামের মতো করে দাঁড় করিয়ে তার ওপরে তেল ঢেলে দিলেন। **তিনি জায়গাটার নাম দিলেন বেথেল [বাইত+এল=বেথেল; যার মানে "আল্লাহর ঘর"]**। এই জায়গাটার কাছের শহরটার আগের নাম ছিল লূস।

এরপর যাকোব [ইয়া'কুব (আ.)] এক প্রতিজ্ঞা করে বলল, "যদি ঈশ্বর আমার সহায় থাকেন, যদি তিনি আমাকে এ যাত্রায় রক্ষা করেন, যদি তিনি আমার খাদ্য ও পরনের কাপড় জোগান, আর যদি আমি শান্তিতে আমার পিতার গৃহে ফিরতে পারি, যদি ঈশ্বর এই সমস্ত কিছুই সাধন করেন, তাহলে প্রভুই আমার ঈশ্বর হবেন।

এই পাথর আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে স্থাপন করছি। এটা প্রমাণ করবে যে এ জায়গা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এবং পবিত্র জায়গা। এবং ঈশ্বর আমাকে যা কিছু দেবেন তার দশ ভাগের এক ভাগ অংশ আমি ঈশ্বরকে দেব।"[৭৩]

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের আলোচ্য অংশে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে বনী ইসরাঈলের পিতা নবী ইয়া'কুব (আ.) আল-আকসার গোড়াপত্তন করেন। ইয়াকুব (আ.) এর ওই স্থানের পাথরটির (হিব্রুতে : Even Ha-Shetiya) ওপরেই বনী ইসরাঈলের নবীগণের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ (Temple Mount) ছিল এবং হাজার হাজার বছর ধরে সেটা ইহুদিদের কিবলা। সেই কিবলা পাথরটির ওপর জেরুজালেমের বিখ্যাত সোনালি গম্বুজের কুব্বাতুস সাখরা (Dome of Rock) মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি বাইতুল মুকাদ্দাস (আল-আকসা) এরিয়ার ভেতরে।[৭৪]

---

[৭৩] ইহুদি *তানাখ*—Bereishit; খ্রিষ্টান *বাইবেল*—আদিপুস্তক/Genesis, ২৮ : ১০-২২

[৭৪] ■ "8 Things you need to know about the Kotel and the Temple Mount_ The Israel Forever Foundation."
https://israelforever.org/interact/blog/8_things_need_to_know_about_kotel_and_temple_mount/
■ "The Foundation Stone of the World – Tourists in Israel.html"
https://touristinisrael.wordpress.com/2016/09/04/the-foundation-stone-of-the-world/
■ "Foundation Stone - Wikipedia"
https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone#Jewish_significance
■ "The Temple Institute_ A Call to Remember.html"
http://www.templeinstitute.org/a-call-to-remember.htm

কুব্বাতুস সাখরা (Dome of Rock), জেরুজালেম, ফিলিস্তিন

সুলাইমান (আ.) আল-আকসার প্রতিষ্ঠাতা—এই কথা বলে যারা হাদিসে উল্লেখিত তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা ইয়া'কুব (আ.) কর্তৃক আল-আকসার গোড়াপত্তনের এই তথ্যগুলো চেপে গেছেন কিংবা তাদের এই তথ্যগুলো মোটেও জানা নেই।

[আদম (আ.) কর্তৃক সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণের কিছু বিবরণ আছে, তবে সেসব বিবরণকে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল কিংবা বাতিল বলে গণ্য করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন : *হাদিসের নামে জালিয়াতি*, খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র.), পৃষ্ঠা : ২৩৪। কাজেই এ ব্যাখ্যাটি বিবেচনায় আনা হলো না।]

অতএব আবারো প্রমাণিত হলো যে, কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত ঐতিহাসিক তথ্যে কোনো অসংগতি নেই; বরং যারা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তাদেরই ইতিহাসজ্ঞানে কমতি রয়েছে।

নিঃসঙ্গ পথযাত্রী

রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাবুক অভিযান। আরবের তপ্ত গ্রীষ্মে মদীনা থেকে শামের (Levant) দিকে যাত্রা। সাহাবীদের নিয়ে ভয়াবহ কঠিন এক সফর শুরু করেছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন রওনা হচ্ছিলেন, তখন কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এ অভিযানে যাবার ব্যাপারে ইতস্তত ভাব প্রকাশ করছিল। পথে কাউকে দেখা না গেলে সাহাবীরা বলতেন, "হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, অমুক আসেনি।" জবাবে তিনি বলতেন, যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয়, তাহলে শিগগিরই আল্লাহ তাঁকে তোমাদের সাথে মিলিত করবেন। না হলে আল্লাহ তাকে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার থেকে তোমাদের নিরাপদ করেছেন। এক সময় আবু যার গিফারী (রা.) এর নামটি উল্লেখ করে বলা হলো, সেও পিঠটান দিয়েছে! আসল ঘটনা হলো, তাঁর উটটি ছিল মন্থর গতির। প্রথমে তিনি উটটিকে দ্রুত চালাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে উঠিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করেন।

এক সাহাবী দূর থেকে তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, রাস্তা দিয়ে কে যেন একজন আসছে!" তিনি বললেন, আবু যারই হবে। লোকেরা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে তাঁকে চিনতে পারল। বলল, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আল্লাহর কসম, এ তো আবু যারই![৭৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده

---

[৭৫] ▪ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা.) সূত্রে বর্ণিত; *আল ইসাবাহ*, ৭/১২৯; ইবন হাজার আসকালানী (র.)

▪ *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬১

অর্থ : আল্লাহ আবু যারকে রহম করুন, যে নিঃসঙ্গ চলে। নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হবে এবং তাঁর হাশরও হবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।[৭৬]

এর বহুদিন পরের ঘটনা। মৃত্যুশয্যায় আবু যার (রা.)। সময়টি তখন ৩১ বা ৩২ হিজরী। মদিনা থেকে কিছু দূরে রাবযা নামক নির্জন এক মরুভূমি। জীবনের শেষ দিনগুলো এখানেই নিঃসঙ্গভাবে অতিবাহিত করেন আবু যার (রা.)। মানব বসতি থেকে বেশ দূরে সেই মরুপ্রান্তর।

তাঁর সহধর্মিণী তাঁর অন্তিমকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

"আবু যারের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে পড়ল, আমি তখন কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, "কাঁদছ কেন?

আমি বললাম : "এক নির্জন মরুভূমিতে আপনি পরকালের দিকে যাত্রা করছেন। এখানে আমার ও আপনার ব্যবহৃত বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত এমন বস্ত্র নেই, যা দ্বারা আপনার কাফন দেওয়া যেতে পারে!"

তিনি বললেন : "কান্না থামাও। তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাসুল ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, যে ... তিনি কতিপয় লোকের সামনে (এটি) বলেছিলেন, তার মধ্যে আমিও ছিলাম, "তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তাঁর মরণের সময়ে মুসলিমদের একটি দল সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হবে।" আমি ছাড়া সেই লোকগুলোর সবাই লোকালয়ে ইন্তিকাল করেছে। এখন একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি—সে ব্যক্তি আমি।

আমি কসম করে বলছি, আমি মিথ্যা বলছি না এবং যিনি এ কথা বলেছিলেন [রাসুলুল্লাহ ﷺ] তিনিও কোনো মিথ্যা বলেননি। তুমি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখো, গায়েবী সাহায্য অবশ্যই এসে যাচ্ছে!"

আমি [আবু যার (রা.) এর স্ত্রী] বললাম : "এখন তো হাজীদেরও প্রত্যাবর্তন শেষ হয়ে গেছে, রাস্তায়ও লোক চলাচল বন্ধ।"

তিনি বললেন, "না! তুমি গিয়ে দেখো।"

---

[৭৬] ■ *তারিখুল ইসলাম*, শামসুদ্দিন যাহাবী (র.), *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৮২;
■ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির (র.), ৫/১৩; *দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ*, বায়হাকী (র.), ৫/২২১-২২২; *আল মুসতাদরাক*, হাকিম (র.), ৩/৬১
■ কেউ কেউ এই বিবরণকে দুর্বল বললেও অনেক ইমাম একে হাসান ও সহীহ বলেছেন। কাজেই এটি একটি দলিলযোগ্য বিবরণ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : *সিলসিলা আহাদিস আস সহিহাহ*, ৩৩২৭, *তাহযিবুত তাহযিব*, ৯/৩৭৩

সুতরাং আমি এক দিকে দৌঁড়ে গিয়ে টিলার ওপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখছিলাম, আবার অপর দিকে ছুটে এসে তাঁর শুশ্রূষা করছিলাম। এরূপ ছোটাছুটি ও অনুসন্ধান চলছিল। এমন সময় দূরে কিছু আরোহী দৃষ্টিগোচর হলো। সেটি ছিল[৭৭] ইরাকের কুফা থেকে আগত একটি কাফেলা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)।

আমি তাঁদের ইশারা করলে তাঁরা দ্রুতগতিতে আমার নিকট এসে থেমে গেল। আবু যার সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করল, "ইনি কে?" বললাম : "আবু যার।"

"রাসুলুল্লাহর ﷺ সাহাবী?"

বললাম : "হ্যাঁ।"

"মা-বাবা কুরবান হোক!", এ কথা বলে তাঁরা আবু যারের কাছে গেল।[৭৮]

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবী আবু যার গিফারী (রা.)। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তিনি তখন বলছিলেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছিলেন, আবু যার, তুমি নিঃসঙ্গ চলবে, নিঃসঙ্গ মারা যাবে এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোমার হাশর হবে!" তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ দ্রুত সওয়ারী হতে নেমে গেলেন। এরপর ইবন মাসউদ (রা.) তাঁদের কাছে তাবুকের পথে আবু যার (রা.)-এর সেই ঘটনাটি এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করলেন।[৭৯]

তাবুকের অভিযান হয়েছিল ৯ম হিজরী সালে।[৮০] আর আবু যার গিফারী (রা.) মৃত্যুবরণ করেন ৩১ বা ৩২ হিজরী সালে। ২০ বছরেরও বেশি সময় পর আবু যার (রা.) এর ইন্তিকাল কীভাবে হবে তা হুবহু বলে দিয়েছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। যার সাক্ষী হিসাবে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এবং আরও অনেকে।

মুহাম্মাদ ﷺ যদি সত্য নবী না হতেন, তাহলে তিনি কীভাবে এই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারলেন? হাদিস ও সিরাহশাস্ত্র ঘেঁটে যারা মুহাম্মাদ ﷺ এর নবুয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, তাদের জন্য প্রশ্নটি তোলা থাকল।

---

[৭৭] এই অংশটুকু ইবন হিশামের বর্ণনায় আছে।

[৭৮] *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬৩

[৭৯] *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৮৩

[৮০] *আর রাহিকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.), [তাওহিদ পাবলিকেশন্স] পৃষ্ঠা : ৪৯১

জিজিয়া কি আসলেই শোষণমূলক বিধান?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে দিক-নির্দেশনা আছে। ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে 'জিজিয়া'। ইসলামের এই দিকটির ব্যাপারে অনেকেরই বেশ অজ্ঞতা রয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন দিকের ন্যায় নাস্তিক-মুক্তমনাদের পক্ষ থেকে এখানেও আপত্তি উত্থাপিত হয়। তাদের দাবি হচ্ছে, জিজিয়া একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা। সত্যি কি তা-ই? জিজিয়ার ব্যাপারে এখন কিছু আলোকপাত করা হবে ইন শা আল্লাহ।

জিজিয়া কী?

জিজিয়া (جزية) শব্দটি جزاء শব্দ হতে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে, মাথাপিছু ধার্যকৃত কর, অর্থকর। এটি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের (আহলুয যিম্মাহ বা

যিম্মি)[৮১] ওপর ধার্যকৃত কর। 'জিজিয়া' শব্দটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলুসী (র.) আল খাওয়ারিজমীর মতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এটি ফার্সি 'গিযইয়াত' শব্দ হতে গৃহীত (রুহুল মাআনী, ১০/৭৮) যার অর্থ খাজনা।[৮২] যিম্মি' (ذمي) শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সংরক্ষিত ব্যক্তি'।[৮৩] শব্দটি দ্বারা তাদের বোঝায় যাদের সাথে যিম্মা (ذمة) বা নিরাপত্তার চুক্তি করা হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে যুদ্ধ করতে সক্ষম অমুসলিমদের নিকট থেকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার বিনিময়ে প্রতিবছর যে অর্থ আদায় করা হয়, তাকে জিজিয়া বলা

---

[৮১] 'যিম্মি'-এর আওতাভুক্ত কারা অর্থাৎ জিজিয়া কি শুধু আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) জন্য নাকি মুশরিক (পৌত্তলিক)-রাও এর অন্তর্ভুক্ত, এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে কিছু ফিকহী ইখতিলাফ আছে। তবে হাদিস থেকে প্রতিষ্ঠিত যে, মুশরিকরাও এর আওতাভুক্ত।

وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِلاَلٍ

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ

"…..যখন তুমি শত্রুপক্ষের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদের তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে। …তারা যদি ইসলামে দাখিল হতে অস্বীকার করে তবে তাদের জিজিয়া দিতে বলো। তার যদি তা দেয় তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করো এবং তাদের আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।…"

[*সহীহ মুসলিম*, ১৭৩১, *সুনান ইবন মাজাহ*, ২৮৫৮, *তিরমিযী*, ১৩০৮, ১৬১৭; *আবু দাউদ*, ২৬১২, ২৬১৩; *মুসনাদ আহমাদ*, ২২৪৬৯, ২২৫২১; *দারিমী*, ২৪৩৯, ২৪৪২; *ইরওয়া*, ১২৪৭, ৭/২৯২; *রাওদুন নাদীর*, ১৬৭। তাহকীক আলবানী : সহীহ।]

وقال الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب .

وكذلك مذهب مالك , فإنه رأى الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد , عربيا أو عجميا , تغلبيا أو قرشيا , كائنا من كان , إلا المرتد

ইমাম কুরতুবী (র.), আওযায়ী (র.) থেকে উল্লেখ করেছেন : জিজিয়া সকল মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক, নাস্তিক কিংবা (ধর্ম) অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

ইমাম মালিক (র.) এর অভিমত হচ্ছে, সকল প্রকার মুশরিক (মূর্তিপূজারি), ধর্মহীন নাস্তিক, আরব, অনারব, তাগলিবি (একটি খ্রিষ্টান গোত্র), কুরাঈশ—সবার কাছ থেকে নেওয়া হবে। শুধু মুর্তাদ ব্যতীত।

[*জামিউল আহকাম আল কুরআন* (তাফসির কুরতুবী), ১১০/৮]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.) এর একটি অভিমত অনুযায়ী :

يَجُوزُ عَقْدُهَا لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، إِلَّا عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ

অর্থ : শুধু আরবের মূর্তিপূজক ব্যতীত যিম্মার চুক্তি সকল কাফিরের সাথে হতে পারে।

[*আল মুকনী*, ইবনু কুদামা (র.), অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ: যিম্মার চুক্তি; আব্দুল কাদির আল আরনাউতের তাহকীক, পৃষ্ঠা : ১৪৬]

ইমাম আবু হানিফা (র.), ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও হানাফী ইমামদের থেকেও অনুরূপ অভিমত পাওয়া যায়। [*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), 'জিযয়া' অংশ, পৃষ্ঠা : ৪০১]
শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাঈমিন (র.) এর অভিমত অনুযায়ীও আহলে কিতাব ছাড়াও মুশরিকদের থেকে জিজিয়া নেওয়া হবে। [*শারহুল মুমতি*, ৮/৫৮] এবং এটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমত।

[৮২] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), 'জিযয়া' অংশ, পৃষ্ঠা : ৪০১

[৮৩] "Dhimmi - New World Encyclopedia"
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dhimmi

হয়।[৮৪] এর বদলে কেউ যাতে তাদের ওপর আগ্রাসন না চালাতে পারে, সে জন্য তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয় ইসলামী সরকার।[৮৫]

জিজিয়ার অর্থ কারা দেবেন ও কেন দেবেন :

মুসলিম শাসককে জিজিয়ার অর্থ পরিশোধ করবেন আর্থিক সক্ষমতা আছে এমন পূর্ণবয়স্ক পুরুষরা। শিশু-কিশোর, নারী, পাগল, দাস-দাসী, প্রতিবন্ধী, উপাসনালয়ের সেবক, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, অতি বয়োবৃদ্ধ এবং বছরের বেশির ভাগ সময়ে রোগে কেটে যায় এমন লোকদের জিজিয়া দিতে হবে না।[৮৬]

অমুসলিমদের কেউ যদি দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত হতে রাজি হন, তাহলে তার জিজিয়া মওকুফ হতে পারে।[৮৭]

যদি ইসলামী সরকার অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে তাদের থেকে কোনো প্রকারের জিজিয়া আদায় করা হয় না; বরং আদায়কৃত জিজিয়া ফেরত দেওয়া হয়।

> ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলিমরা শামের (বৃহত্তর সিরীয় অঞ্চল) বিস্তীর্ণ এলাকা পরিত্যাগ করে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন আবু উবাইদাহ (রা.) নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেসব জিজিয়া ও খারাজ (ভূমি রাজস্ব) অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং তাদের বলো যে, "এখন

---

[৮৪] ■ *খলিফাতু রাসূলিল্লাহ আবু বাকর আছছিদ্দীক (রা.)*, ড. আহমদ আলী, পৃষ্ঠা : ৩৫৬

■ "...it is paid in exchange for providing protection for the lives and possessions of the Thimmis who refuse to embrace Islam and choose to retain their unbelief, while awarding them freedom to practice their religion and live in peace among Muslims. Therefore, whenever the Companions may Allaah be pleased with them feared inability to protect the lives and possessions of the Thimmis - from external aggression - they used to pay them back the Jizyah (for non-satisfaction of its pre-condition, namely, protection)." http://www.islamweb.net/en/fatwa/268732/

[৮৫] "...in return for their being allowed to settle in Muslim lands, and in return for protecting them against those who would commit aggression against them." https://islamqa.info/en/214074

[৮৬] ■ *আল মুগনী*, ইবনু কুদামা মাকদিসী (র.), খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা : ২৭০-২৭৩;
■ *বাদা'ই*, আল কাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা : ১১১

[৮৭] ■ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), 'জিযয়া' অংশ, পৃষ্ঠা : ৪০১
■ *আহকামুয যিম্মিয়িন ওয়াল মুসতা'মিমীন ফি দারি ইসলাম*, আব্দুর কারিম যায়দান, পৃষ্ঠা : ১৫৭

> আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম। তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি।"
>
> এই নির্দেশ মোতাবেক সকল সেনাপতি অমুসলিম নাগরিকদের তাদের থেকে আদায় করা জিজিয়া ও খারাজের অর্থ ফেরত দিলেন।[৮৮]

এ সময়ে অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী (র.) লিখেছেন, "মুসলিম সেনাপতিগণ যখন শামের হিমস নগরীতে জিজিয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার (খ্রিষ্টান) অধিবাসীরা সমস্বরে বলে ওঠে—

> ইতিপূর্বে যে জুলুম-অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচারকে আমরা পছন্দ করি। এখন আমরা তোমাদের গভর্নরের [আবু উবাইদাহ (রা.)] সাথে মিলে যুদ্ধ করে হিরাক্লিয়াসের বাহিনীকে দমন করব।"
>
> সেখানকার ইহুদিরা সমস্বরে বলে ওঠে, "আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোনো অবস্থাতেই হিরাক্লিয়াসের কোনো প্রতিনিধি আমাদের শহরে ঢুকতেই পারবে না।"[৮৯]

জিজিয়াতে কীভাবে অর্থ নেওয়া হয়?

জিজিয়াতে কী বিশাল-পরিমাণ অর্থ নেওয়া হয়, যার ভারে অমুসলিম নাগরিকরা চিরে চ্যাপ্টা হয়ে যায়? এমন কিছু ধারণা ইসলামবিরোধী মহলে প্রচলিত আছে। চলুন বাস্তবতা দেখে নেওয়া যাক!

জিজিয়ার অর্থের পরিমাণ অমুসলিম নাগরিকদের আর্থিক সংগতি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। যারা সচ্ছল তাদের কাছ থেকে বেশি, যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কিছু কম এবং যারা দরিদ্র, তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেওয়া হয়। আর যার উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা নেই অথবা যে অন্যের দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিজিয়া ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, জিজিয়ার কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত নেই।[৯০] তবে জিজিয়ার কিছু মূলনীতি পাওয়া যায়।

---

[৮৮] *কিতাবুল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ (র.), পৃষ্ঠা : ১১১

[৮৯] *ফুতুহুল বুলদান*, আল বালাযুরী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬২

[৯০] *খলিফাতু রাসূলিল্লাহ আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.)*, ড. আহমদ আলী, পৃষ্ঠা : ৩৫৭

এর আলোকে ফকিহগণ জিজিয়ার বিভিন্ন মুদ্রামান উল্লেখ করেছেন।[৯১] এই মূলনীতি ও সাহাবীদের যুগের উদাহরণ এখন উল্লেখ করা হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর সাধ্যের অতীত জিজিয়া চাপানো যায় না। জিজিয়া অবশ্যই তাদের সাধ্যের মধ্যে হতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا مَنْظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَالْقِيَامَةِ

> অর্থ : 'সাবধান! যদি কোনো মুসলিম কোনো মুআহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক) এর ওপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তাকে ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।'[৯২]

ইসলাম কি জিজিয়া দিতে অক্ষম ব্যাক্তিকে নির্যাতন করতে বলে? এ-সংক্রান্ত মূলনীতিও আমরা হাদিস থেকে পেয়ে যাই।

> উরওয়া বিন যুবায়ের বিন আওয়াম থেকে হিশাম বিন উরওয়ার মাধ্যমে আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন, উমার (রা.) সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক স্থানে দেখলেন, কয়েকজন লোককে প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন, ব্যাপার কী? লোকেরা বলল, এদের ওপর জিজিয়া অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু এরা জিজিয়া পরিশোধ করেনি। তাই তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বললেন, এরা জিযিয়া পরিশোধ করতে চায় না কেন? লোকেরা বলল, এরা বলছে, এরা কপর্দকহীন। উমার (রা.) বললেন, এদের ছেড়ে দাও। সাধ্যবহির্ভূত বোঝা এদের ওপর চাপিয়ো না। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, **"মানুষকে শাস্তি দিয়ো না। পৃথিবীতে মানুষকে যারা (অন্যায়ভাবে) শাস্তি দেবে, আখিরাতে আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন।"**[৯৩]

আমরা দেখলাম, কিছু লোক মূলনীতি না জেনে জিজিয়া দিতে অক্ষম কিছু যিম্মিকে

---

[৯১] বিস্তারিত এখান থেকে দেখা যেতে পারে :
"Definition of jizyah, its rate and who has to pay it – islamqa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)"
https://islamqa.info/en/214074

[৯২] *সুনান আবু দাউদ*, হাদিস নং : ৩০৫২

[৯৩] ■ *তাফসির মাযহারী*, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.), ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩০৬
■ আরও দেখুন : *সুনান আবু দাউদ*, অনুচ্ছেদ : (১৭০) জিযিয়া কর আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ সম্পর্কে; হাদিস নং : ৩০৩৪ (সহীহ)

কষ্ট দিচ্ছিল। উমার (রা.) তা দেখতে পেয়ে তাদের বিরত করেন এবং রাসুল ﷺ-এর বাণী স্মরণ করিয়ে দেন।

> খলিফা উমার (রা.) এর শাসনামলে একজন জিজিয়া সংগ্রহকারী সংগ্রহকৃত জিজিয়া উমার (রা.) এর নিকট অর্পণ করলেন। বিপুল-পরিমাণ জিজিয়ার অর্থ দেখে উমার (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লেন। উমার (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি জনগণের এগুলো চাপিয়ে দেননি তো! তিনি উত্তর দিলেন, "মোটেও না। আমরা শুধু উদ্বৃত্ত এবং বৈধ অংশই সংগ্রহ করেছি।" উমার (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো প্রকারের চাপ কিংবা অত্যাচার ব্যতিরেকে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" **উমার (রা.) বললেন, "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, আমার শাসনকালে অমুসলিম প্রজাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে না।"**[১৪]

আমিরুল মু'মিনীন উমার (রা.) এর ওসিয়ত ছিল :

> "...আমি তাঁকে এ ওয়াসিয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের অধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কেননা, তারাও ইসলামের হেফাযতকারী। এবং তারাই ধন-সম্পদের জোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের থেকে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবল তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লিবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করারও ওয়াসিয়ত করছি। কেননা, তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। **আমি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর যিম্মিদের বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ করা হয়। (তারা কোনো শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে) তাদের পক্ষাবলম্বে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি-সামর্থ্যের অধিক জিজিয়া যেন চাপানো না হয়।"**[১৫]
>
> ১ম খলিফা আবু বকর (রা.) বলেন, "যদি কোনো অমুসলিম বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে অথবা কোনো বিপদে পতিত হয় অথবা কোনো সম্পদশালী যদি এমনভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে যে তার গোত্রের লোকেরা তাকে সাহায্য করে—এরূপ পরিস্থিতিতে তাকে জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। উপরন্তু মুসলিমদের বাইতুল মাল (ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার) থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যতদিন সে মদীনায় বা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে

---

[১৪] ■ *আল আমওয়াল*, ইমাম আবু উবায়দ আল কাসিম (র.), পৃষ্ঠা : ৪৩
■ *আল মুগনী*, ইবনু কুদামা মাকদিসী (র.), খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৯০
■ *আহকাম আহলুয যিম্মাহ*, ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ (র.), খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৯

[১৫] *সহীহ বুখারী*, হাদিস নং : ৩৪৩৫

আলী (রা.) আদেশ প্রদান করেন,

"যখন তাঁদের কাছে [ভূমি রাজস্বের] জন্য যাও, তাদের শীত বা গ্রীষ্মের জন্য উদ্বৃত্ত পোশাক বিক্রি করে দিয়ো না। তাদের আহারের খাদ্য, তাদের প্রয়োজনীয় পশু বিক্রি কোরো না। দিরহামের জন্য তাদের কাউকে কখনো চাবুক মেরো না। অথবা দিরহামের জন্য কখনো তাদের কাউকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখো না। তাদের গৃহস্থালি জিনিসপত্র বিক্রি কোরো না। কারণ, আমরা তো সেটাই গ্রহণ করি, যা তাঁদের হাতে আছে। যদি আমার এ আদেশ মেনে না চলো, তাহলে আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। আর আমি যদি তোমাদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ শুনি, তাহলে তোমরা বরখাস্ত হবে।"[১৭]

এই মূলনীতি অনুসরণ করে ইসলামী ফিকহগ্রন্থগুলোতে জিজিয়া-সংক্রান্ত বিধান আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসী (র.) উল্লেখ করেছেন :

যে সকল অমুসলিম নাগরিক দারিদ্র্যের শিকার ও পরের ওপর নির্ভর করে চলে, তাদের জিজিয়া মওকুফ তো করা হবেই উপরন্তু বাইতুল মাল থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্য বরাদ্দ দিতে হবে।[১৮]

একবার খলিফা উমার (রা.) এক অন্ধ বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখেন। এ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে সে ইহুদি। উমার (রা.) জানতে চাইলেন, কেন সে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। জবাবে সে জানালো : জিজিয়া, প্রয়োজন এবং জীবনধারণের চাহিদা। খলিফা উমার (রা.) হাত ধরে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন, তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজন পূরণ করেন এবং বাইতুল মালের খাজাঞ্চির কাছে বার্তা পাঠান, "এ ব্যক্তি এবং এর মতো অন্য ব্যক্তিদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। আল্লাহর কসম! আমরা যৌবনে (জিজিয়া) নিয়ে বার্ধক্যে তাকে কষ্ট দিলে তার প্রতি এটা আমাদের ইনসাফ করা হবে না। সদকা তো নিঃসন্দেহে অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের জন্য। আর এ হচ্ছে আহলে কিতাবের নিঃস্ব ব্যক্তি।[১৯]

খলিফা উমার (রা.) দামেস্ক সফরকালে একস্থানে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত কিছু

---

[১৬] *কিতাবুল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ (র.), পৃষ্ঠা : ১৪৪

[১৭] *কিতাবুল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ (র.), পৃষ্ঠা : ১৫-১৬

[১৮] *আল মুগনী*, ইবনু কুদামা মাকদিসী (র.), খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৭২

[১৯] ■ *কিতাবুল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ (র.), পৃষ্ঠা : ১২৬
■ *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ, পৃষ্ঠা : ১৭৭-১৭৮

খ্রিষ্টানকে দেখতে পান। তিনি তাদের সরকারি কোষাগার (বাইতুল মাল) থেকে সাহায্য দেবার নির্দেশ দেন। তাদের জীবন-জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহেরও নির্দেশ তিনি দেন।[১০০]

আবু বকর (রা.) এর সময়ে জিজিয়ার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। সে সময়ে মুসলিমদের দ্বারা বিজিত হিরা অঞ্চলের অধিবাসীর কাছ থেকে বছরে মাত্র ১০ দিরহাম আদায় করা হতো। সংগ্রহ করতেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)।[১০১]

আমরা দেখলাম যে, জিজিয়ার পরিমাণ যেমন অমুসলিম নাগরিকদের সাধ্যের মধ্যে থাকতে হবে, এ জন্য অন্যায়ভাবে কাউকে নির্যাতন করা যাবে না। তেমনি এটিও বলা হচ্ছে যে তারা যদি দারিদ্র্যের শিকার হয় কিংবা অর্থাভাবে থাকে, উল্টো ইসলামী সরকার তাদের সাহায্য করবে! এমন বেশ কিছু উদাহরণ আমরা উত্তম যুগে ন্যায়পরায়ণ খলিফাদের আমল থেকে পাচ্ছি। যারা জিজিয়াকে শোষণমূলক ব্যবস্থা বলতে চান বা ইসলামকে নিষ্পেষণকারী ধর্ম বলতে চান, এই তথ্যগুলো তাদের নিদারুণ ভ্রান্তিকেই পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে। লুটতরাজ আর বর্বরতায় ভরা সেই ৭ম শতাব্দীতে শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীগুলো ভিন্নধর্মীদের ওপর জোর-জুলুম চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই অন্ধকার যুগে এভাবে অন্য ধর্মের লোকদের সাথে সদাচরণের বিধান দিয়েছিল নবী মুহাম্মাদ ﷺ আনিত ইসলাম। চিন্তাশীলদের জন্য এটি একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে।

যাকাত-জিজিয়া ও শরিয়ানির্ভর ব্যবস্থার ফল

আমরা এতক্ষণ তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। এবার আমরা আমাদের দেশ ও নিকট অঞ্চলগুলোতে ইসলামী শরিয়ানির্ভর শাসনব্যবস্থার ফলাফলের ব্যাপারে আলোচনা করব, যেখানে যাকাত, জিজিয়া এই জিনিসগুলো প্রচলিত ছিল। এতে আমাদের পক্ষে এই ব্যবস্থার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে কেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা বোঝা সহজ হবে। আমরা অনুধাবন করতে পারব ইসলামী বিধান কি কল্যাণকর নাকি শোষণমূলক অথবা এখানে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে তা কেমন প্রভাব ফেলতে পারে।

ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম ইসলামী শাসন দেখে মুহাম্মাদ বিন কাসিম (র.) এর সিন্ধু বিজয়ের সময়ে। তিনি বিজিত অঞ্চলগুলোতে ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী শাসন কায়েম

---

[১০০] ■ *ফুতুহুল বুলদান*, আল বালাযুরী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৭
■ *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), সাইয়িদ কুতুব শহীদ, পৃষ্ঠা : ১৭৮

[১০১] *কিতাবুল আমওয়াল*, আবু উবাইদাহ, পৃষ্ঠা : ২৭

করেন। এই সময়ের আলোচনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা, সেটি ছিল সালাফে সলিহীনদের (Early righteous Muslims) যুগ। সাহাবীদের যুগ ছিল ১১০ হিজরী পর্যন্ত।[১০২] মুসলিমরা সিন্ধু বিজয় করে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে বা ৯৩ হিজরীতে।[১০৩] অর্থাৎ সেই সময়টি ছিল সাহাবীদের যুগের অন্তর্ভুক্ত, দ্বীন ইসলাম তখন নববী আদর্শ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে পালিত হচ্ছিল। মুহাম্মাদ বিন কাসিম (র.) যখন সিন্ধু বিজয় করেন, তখন তিনি বিজিত অংশে স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করেন ও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে জোর করা হয়নি বা শোষণও করা হয়নি। মুসলিমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে।[১০৪] জাত-বর্ণহীন ইসলামের মহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে বরং স্থানীয় অধিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করছিল।[১০৫]

আমাদের দেশ এবং গোটা ভারতবর্ষ সর্বশেষ ইসলামী শাসন দেখেছিল মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব (র.) [আলমগীর] এর সময়ে। সম্রাট আওরঙ্গজেব (র.) ভারতবর্ষে ইসলামী শরিয়া কায়েম করেন। জিজিয়া আরোপের জন্য তাঁকে পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা সমালোচনার বাণে বিদ্ধ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আওরঙ্গজেব (র.) এর গৃহীত ব্যবস্থার ফল কী রূপ ছিল? চলুন দেখে নেওয়া যাক।

সম্রাট আওরঙ্গজেব (র.) এর সময়ে মুসলিমদের ওপরে যাকাত এবং অমুসলিমদের ওপর জিজিয়া আরোপ করা হয়, সেই সাথে অন্য সব কর উঠিয়ে দেওয়া হয়। ইসলামের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে : জনগণের ওপর কর আরোপ করা যায় না।[১০৬] আওরঙ্গজেব (র.) ইসলামী বিধান অনুসরণ করে আগের শাসকদের আরোপিত ৮০টি কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবং শুধু যাকাত ও জিজিয়া চালু করেছিলেন। এতগুলো কর উঠিয়ে দেওয়ার ফলে সে সময়ের হিসাবে ৫০ লক্ষ স্টার্লিং (একপ্রকার ব্রিটিশ মুদ্রা)

---

[১০২] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮

[১০৩] *History of Sindh* (Government Of Sindh, Pakistan)
http://www.sindh.gov.pk/dpt/history%20of%20sindh/history.htm

[১০৪] ■ Nicholas F. Gier, FROM MONGOLS TO MUGHALS: RELIGIOUS VIOLENCE IN INDIA 9TH-18TH CENTURIES, Presented at the Pacific Northwest Regional Meeting American Academy of Religion, Gonzaga University, May, 2006
■ আরও দেখুন : https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Qasim#Administration_by_Muhammad_bin_Qasim

[১০৫] "ইসলাম যেভাবে হিন্দুস্তানে আসে ইসলামের হারানো ইতিহাস"
https://lostislamichistorybangla.wordpress.com/২০১৪/১১/১৭/হিন্দুস্তানে-ইসলাম-আগমন/

[১০৬] "Ruling on working as a tax adviser – islamqa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)"
https://islamqa.info/en/243867

সমমানের অর্থমূল্যের কর থেকে রাজকোষ বঞ্চিত হয়। রাজকোষের দিকে লক্ষ না করে তিনি আল্লাহর বিধান পালনের দিকে জোর দিয়েছিলেন।[১০৭] এভাবে কর উঠিয়ে দিলে স্বাভাবিকভাবেই দ্রব্যমূল্যের দাম কমে যাবে এবং জনগণের আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো হয়ে যাবে। আল্লাহর বিধান আরোপের ফলে দেশের ওপর বারাকাহ আসবে। এবং হয়েছেও ঠিক তা-ই। সম্রাট আওরঙ্গজেব (র.) এর সময়ে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে চীনকে পিছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতিতে (World's Largest Economy) পরিণত হয়, যার মূল্যমান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। এর জিডিপি ছিল সে সময়ের সমগ্র বিশ্বের ৪ ভাগের ১ ভাগ।[১০৮] অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন এমনই প্রাচুর্যশালী হয়ে গিয়েছিল। জিজিয়া দিয়ে কেউ 'শোষিত' হয়নি। জনগণ কোন অবস্থায় শোষিত হয়—৮০ টি কর থাকাকালে, নাকি মাত্র ১টি জিজিয়া কর থাকাকালে?

সে সময়ে ইসলামী শাসনের সুফল ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া বাংলাতেও লেগেছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব (র.) নিযুক্ত মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে বাংলায় ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। সে সময়ে বাংলা সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা আজও প্রবাদ হয়ে আছে।[১০৯] দুঃখের বিষয় হলো মানুষ শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার সমৃদ্ধির কথা ঠিকই মনে রেখেছে, কিন্তু ইসলামী শাসনকে মনে রাখেনি।

পরিশেষে বলব, জিজিয়াকে শোষণমূলক ব্যবস্থা আখ্যায়িত করে যে প্রচার চালানো হয়, তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা ইসলামের মাঝে সকল যুগের সকল মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। তবে একটা কথা না বললেই নয়, জিজিয়া প্রদান করে অমুসলিমগণ হয়তো পার্থিব কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবে, কিন্তু পরকালে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন তো একটাই, আর তা হলো ইসলাম। পরকালে মুক্তি লাভের জন্য সকলকে সত্য দ্বীন গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ সকলকে সত্য অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন।

---

[১০৭] *A Vindication of Aurangzeb*, Sadiq Ali, Page 128-130
বইটি এখান থেকে পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে :
https://archive.org/details/AVindicationOfAurangzebBySadiqAli/page/n137

[১০৮] Maddison, Angus (2003): *Development Centre Studies The World Economy Historical Statistics*: Historical Statistics, OECD Publishing, ISBN 9264104143, pages 259–261

[১০৯] "শায়েস্তা খান - বাংলাপিডিয়া"
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=শায়েস্তা খান

নিঃসন্দেহে হিদায়াত কেবল আল্লাহ্ আযযা ওয়া যাল এর পক্ষ থেকেই আসে।

> “তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতে, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী কিন্তু তাদের অধিকাংশই তো ফাসিক।”[১১০]

---

[১১০] *আল কুরআন*, আলি ইমরান, ৩ : ১১০

কুরআন কি সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যাবার কথা বলে? কুরআন কি পৃথিবীকে সমতল বলে?

নাস্তিক প্রশ্ন : যুলকারনাইন সূর্যের অস্তাগমন (অর্থাৎ সর্বপশ্চিম) স্থলে পৌঁছান যেখানে সূর্য এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায় (Quran ১৮:৮৬), এরপর তিনি অন্য এক পথ ধরেন এবং সূর্যের উদয় (অর্থাৎ সর্বপূর্ব) স্থলে পৌঁছান, যা এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হয় যারা সূর্যের কাছাকাছি হওয়ায় তাপ থেকে কোনো আড়াল পায় না (Quran ৯০-১৮:৮৯)! এর থেকেই কি বোঝা যায় না যে পৃথিবী সমতল, যার দুই সর্বশেষ প্রান্ত আছে?

উত্তর : *আল কুরআনে* বলা হয়েছে :

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

> অর্থ : অবশেষে সে যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছাল; তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখল এবং সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন, তুমি তাদের শাস্তি দিতে পার অথবা তাদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।[১১১]

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

> অর্থ : অবশেষে সে যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছাল, তখন সে একে এমন এক

---

[১১১] *আল কুরআন*, কাহফ, ১৮ : ৮৬

সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হতে দেখল, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।[১১২]

পৃথিবী গোল নাকি সমতল এ ব্যাপারে কুরআন কী বলে?

আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ৭ আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (কুরআন ৬৭ : ৩; ৭১ : ১৫) এ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর আলোচনায় আল বিকাঈ (র.) তাঁর *নাযমুদ দুরার ফি তানাসুবুল আয়াত ওয়াস সুয়ার (তাফসির বিকাঈ)*-এ বলেছেন,

> "আয়াতে আসমানসমূহকে যথাযথ স্তর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক স্তরের ওপর আরেক স্তর, যা নির্দেশ করে যে, এগুলো প্রতিসম। **এটা কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে, যদি পৃথিবী গোলাকার হয় এবং ১ম আসমান পৃথিবীকে ঠিক সেভাবে বেষ্টন করে রাখে যেভাবে ডিমের খোসা ডিমকে সব দিক থেকে বেষ্টন করে রাখে।** একই ভাবে ২য় আসমানও ১ম আসমানকে বেষ্টন করে রাখে। এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আরশ সবকিছুকে বেষ্টন করে। এর মধ্যে আরশের সবচেয়ে নিকটে হচ্ছে কুরসী, যা আরশের তুলনায় মরুভূমির মধ্যে একটি আংটির মতো। কাজেই যা কিছু কুরসীর নিচে আছে, সেগুলো আর কী রকমেরই-বা হতে পারে? প্রতিটি আসমান একে অন্যের ওপরে সমান অনুপাতে আছে। এটি জ্যোতির্বিদদের দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত তথ্য। এবং শরিয়তের কোনো তথ্য এর সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রমাণিত নয়; বরং নস (কুরআন-সুন্নাহর পাঠাংশ) দ্বারা এর সত্যতারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।"[১১৩]

আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর প্রাচীন আলিমদের ইজমা বা ঐকমত্য ছিল যে, পৃথিবী গোল।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া (র.) বর্ণনা করেছেন : আবুল হুসাইন ইবনুল মুনাদি (র.) [ইমাম আহমাদ (র.) এর ছাত্রের ছাত্র] বলেছেন,

وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة . قال : ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من فى نواحى الأرض فى وقت واحد ، بل على المشرق قبل المغرب

> অর্থ : "...একই ভাবে তাঁরা **(আলেমগণ) একবাক্যে একমত হয়েছেন যে, ভূপৃষ্ঠ এবং সমুদ্র ধারণকারী পৃথিবী একটি গোলকের ন্যায়।** তিনি বলেন, এর

---

[১১২] *আল কুরআন*, কাহফ, ১৮ : ৯০

[১১৩] "Size of each heaven compared to one above it - Islam web - English" https://bit.ly/2Nb6zMN

ইঙ্গিত তো পাওয়া যায় এই ব্যাপারটি থেকে, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সাথে উদয় ও অস্ত যায় না; বরং এটি (উদয়-অস্ত) পশ্চিম দিকের চেয়ে পূর্ব দিকে আগে ঘটে।"[১১৪]

আবু মুহাম্মাদ ইবন হাজম (র.) বলেছেন :

وهذا حين نأخذ إن شاء الله تعالى فى ذكر بعض ما اعترضوا به ، وذلك أنهم قالوا : إن البراهين قد صحت بأن الأرض كروية ، والعامة تقول غير ذلك ، وجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن أحداً من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضى الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض ، ولا يحفظ لأحد منهم فى دفعه كلمة ، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها ...

অর্থ : (পৃথিবী গোল—এ কথার) বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দেওয়া হয় আমরা এর কয়েকটির ব্যাপারে আলোচনা করব।

তাঁরা বলেন, পৃথিবী গোল—এ ব্যাপারে ভালো প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু আম জনতা এর বিপরীত কথা বলে। আল্লাহর তাওফিকে এ ব্যাপারে আমাদের জবাব : মুসলিম উম্মাহর কোনো ইমাম অথবা ইলমের দ্বারা যাঁরা ইমাম অভিধা লাভের যোগ্য (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)—তাঁদের কেউই এ কথা অস্বীকার করেননি যে, পৃথিবী গোল। তাঁদের থেকেই কথা অস্বীকার করে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি; **বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এটি (পৃথিবী) গোল।**[১১৫]

শায়খ ইবন উসাঈমিন (র.) তাঁর *ফাতাওয়া নুরুন 'আলাদ দারব* গ্রন্থে বলেছেন,

পৃথিবী গোল। এই কথার ভিত্তি হচ্ছে কুরআন, বাস্তবতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কুরআনের প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াতটি, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

অর্থ : তিনি [আল্লাহ] যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের ওপর এবং দিনকে রাতের ওপর জড়িয়ে দিয়েছেন এবং

---

[১১৪] *মাজমু আল ফাতাওয়া*, ২৫/১৯৫

[১১৫] *আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া'* ওয়ান নিহাল, ২/৭৮

নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখো, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।[১১৬]

এখানে يُكَوِّرُ শব্দটির মানে হলো জড়িয়ে দেওয়া (বা প্যাঁচিয়ে দেওয়া) যেভাবে পাগড়ি প্যাঁচানো হয়। এটি সবাই জানে যে পৃথিবীতে রাত ও দিন একে অন্যের অনুসরণ করে। এর মানে দাঁড়ায়—পৃথিবী গোল; কেননা, কোনো কিছুকে যদি অন্য কিছুর ওপর প্যাঁচিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই জিনিসটি যদি পৃথিবীকে ঘিরে প্যাঁচানো থাকে, তাহলে পৃথিবীকে অবশ্যই গোল হতে হবে।[১১৭]

এ-সংক্রান্ত ফতোয়ায় শায়খ বিন বাজ (র.) বলেছেন,

"আহলুল ইলমদের (আলেমগণের) মতে পৃথিবী গোল। কেননা, ইবন হাজম (র.) এবং আলেমদের আরও একটি দল এ ব্যাপারে আহলুল ইলমদের থেকে এটি (পৃথিবী) গোল বলে ইজমা বর্ণনা করেছেন। এর মানে হচ্ছে, এর পুরো অংশ এমনভাবে একত্র আছে যে, পুরো গ্রহটিকে একটি গোলকের মতো দেখায়। কিন্তু আমাদের প্রতি দয়াস্বরূপ আল্লাহ এর উপরিভাগকে আমাদের জন্য বিস্তৃত করেছেন, সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন এবং জীব-জন্তু ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেছেন :

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

অর্থ : আর পৃথিবীর দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?[১১৮]

সুতরাং একে আমাদের কাছে সমতল বলে মনে হয় যাতে এর ওপর মানুষ বাস করতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে থাকতে পারে। এটি গোল তা এর এই সমতল হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, কোনো গোল জিনিসের আকৃতি যদি খুব বৃহৎ হয়, তাহলে এর পৃষ্ঠ অনেক প্রসারিত হয়ে যায় (এবং সমতল বলে মনে হয়)।[১১৯]

---

[১১৬] *আল কুরআন*, যুমার ৩৯ : ৫

[১১৭] "Consensus that the Earth is round"- islamQA (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) https://islamqa.info/en/118698

[১১৮] *আল কুরআন*, গাশিয়াহ, ৮৮ : ২০

[১১৯]. শায়খ বিন বাজ (র.) এর ফতোয়ার ওয়েবসাইট থেকে :

"الأرض كروية أم سطحية ؟"

http://www.binbaz.org.sa/mat/18030

সূর্যের "পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যাওয়া"

যুলকারনাইন সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেছিলেন এ থেকে অনেকে দাবি করেন, "এটা বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল; কেননা, সূর্য কখনো জলাশয়ে অস্ত যায় না। এবং পৃথিবী সমতল।"

কিন্তু তাদের এ দাবি মোটেও সঠিক নয়। তাদের দাবি সঠিক হতো যদি কুরআন বলত যে সূর্য আসলেই পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায়। কিন্তু কুরআন তা বলছে না, কুরআন শুধু এটাই বলছে যে—**যুলকারনাইন সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেছেন**। যুলকারনাইন কী দেখেছেন কুরআন এখানে সেটি বলছে। আর কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে কি না তা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ

> অর্থ : অবশেষে সে যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছাল; তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখল।[১২০]

এখানে حَمِئَةٍ শব্দের অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। অর্থাৎ তিনি সূর্যকে তার দৃশ্যে মহাসাগরে ডুবতে দেখলেন। সাধারণত যখন কেউ সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া প্রত্যক্ষ করবে, তখনই তার এটা মনে হবে, অথচ সূর্য কখনো তার কক্ষপথ ত্যাগ করেনি। *[ইবন কাসির]*

এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রংও কালো দেখায়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত তা হলো, কুরআন এ কথা বলেনি যে, সূর্য কালো জলাশয়ে ডোবে; বরং এখানে যুলকারনাইনের অনুভূতিই শুধু ব্যক্ত করা হয়েছে।[১২১]

অভিযোগকারীরা আরও বলেছেন, "যুলকারনাইন সূর্যের উদয় (অর্থাৎ সর্বপূর্ব) স্থলে পৌঁছান, যা এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হয়, যারা সূর্যের কাছাকাছি হওয়ায় তাপ থেকে কোনো আড়াল পায় না।"

আল্লাহ্ বলেছেন :

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

---

[১২০] *আল কুরআন, কাহফ*, ১৮ : ৮৬

[১২১] সূত্র : *কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির)*, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ২য় খণ্ড, সুরা কাহফের ৮৬নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ১৫৮৬

> অর্থ : "অবশেষে সে যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছাল, তখন সে একে এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হতে দেখল, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।"[১২২]

আলোচ্য আয়াতে, "যারা সূর্যের কাছাকাছি হওয়ায় তাপ থেকে কোনো আড়াল পায় না" মোটেও এমন কথা বলা হয়নি। "সূর্যের কাছাকাছি হওয়ায়" কথাটি অভিযোগকারীরা নিজ থেকে যোগ করেছেন যাতে কুরআনের এই আয়াতটি থেকে বৈজ্ঞানিক ভুল (!) বের করা যায়। সত্যিই মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টা বড় বিচিত্র প্রকৃতির। নিজেদের "মুক্তমনা" দাবি করা কিছু মানুষ যখন একটি ধর্মকে ভুল প্রমাণ করার জন্য সে ধর্মের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে মিথ্যাচার করে, নিজেদের কথা প্রবেশ করিয়ে বৈজ্ঞানিক ভুল (!) বের করার বৃথা চেষ্টা করে, তখন বিবেকবান মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—এ কেমন 'মুক্তমনা'! অসৎ পন্থায় নিজেদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে কি কোনোক্রমেই মুক্ত মন-মানসিকতা বলা যায়? 'মুক্তমনা'র মানে কি এখন এই দাঁড়িয়েছে—"মুক্তভাবে মিথ্যাচার করা!"

ইমাম ইবন কাসির (র.) আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে বলেন :

> যুলকারনাইন পশ্চিম থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। সেখানকার অধিবাসীরা ঘরবাড়ি তৈরি করত না, সেখানে কোনো গাছপালা ছিল না, রোদের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেখানে কিছু বিদ্যমান ছিল না।

এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (র.) এর উক্তি এই যে, সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতো না। সূর্য উদিত হবার সময়ে তারা সুড়ঙ্গে চলে যেত, সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের জীবিকার অন্বেষণে দূরবর্তী খেত-খামারে ছড়িয়ে পড়ত। (*তাবারী*, ১৮/১০০)[১২৩]

এ ছাড়া ইসলামবিরোধীরা একটি হাদিস দেখিয়ে দাবি করতে চায় রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সূর্য গরম পানির জলাশয়ে অস্ত যায়।

> আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত, একবার আমি সূর্যাস্তের সময় আল্লাহর নবীর পেছনে বসে গাধার পিঠে করে যাচ্ছিলাম। তখন আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি জানো সূর্য কোথায় অস্ত যায়?" আমি বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর নবীই ভালো জানেন।" তখন তিনি বললেন, "এটি অস্ত যায় গরম

---

[১২২] *আল কুরআন*, কাহফ, ১৮ : ৯০

[১২৩] সূত্র : *তাফসির ইবন কাসির* (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, মার্চ ২০১৪ সংস্করণ), ৫ম খণ্ড, সুরা কাহফের ৯০নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ১২১-১২২

পানির জলাশয়ে।”[১২৪]

কিন্তু হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল এবং দলিলযোগ্য নয়। এমন দুর্বল হাদিস দেখিয়ে কোনোমতেই বলার উপায় নেই যে, এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য।[১২৫]

মোটকথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রাচীন তাফসিরকারকরাও [যেমন ইবন কাসির (র.)] এমনটি বোঝেননি যে, সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ের মধ্যে অস্ত যায়, যুলকারনাইন সূর্যের কাছাকাছি গিয়েছিলেন কিংবা পৃথিবী সমতল। আল কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য সনদের হাদিসের আলোকে প্রাচীনকাল থেকেই মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) এটাই যে—পৃথিবী গোল।

---

[১২৪] *সুনান আবু দাউদ*, হাদিস নং : ৩৯৯১

[১২৫] “The correct way to describe the sun is that it “prostrates beneath the Throne” and not that it “sets in a spring of warm water” - islamQA (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) https://islamqa.info/en/176375

হাদিসে গিরগিটি (ওয়াযাগ) হত্যার বিধান প্রসঙ্গে

নাস্তিক প্রশ্ন : হাদিসে বলা হয়েছে ইবরাহিমের (আ.) অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দেবার অপরাধে গিরগিটি মেরে ফেলতে হবে, কেউ যদি ১ম আঘাতে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে তার জন্য অনেক পুণ্য। বহু যুগ আগের কোনো এক গিরগিটির কাজের জন্য কেন এখনো গিরগিটি মেরে ফেলতে হবে? এটা কি একের দোষে অন্যকে শাস্তি দেওয়া নয়? একজন স্রষ্টা কীভাবে নিরীহ গিরগিটি মেরে ফেলবার আদেশ দিতে পারেন?

উত্তর : এ পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি—অতিকায় প্রাণী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রকায় ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত। গিরগিটিও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। কাজেই এর ব্যাপারে আল্লাহর কিছু সুনির্দিষ্ট হুকুম-আহকাম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শুরুতেই আমরা এই প্রাণীটির ব্যাপারে আল্লাহর বিধান দেখে নিই।

وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». متفق عَلَيْهِ

> অর্থ : উম্মে শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ 'ওয়াযাগ' (গিরগিটি/Gecko) মারতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, "এ ইবরাহিম (আ.) এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দিয়েছিল।"[১২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ، كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، أَدْنَى مِنَ

---

[১২৬] *সহীহ বুখারী*, ৩৩০৭, ৩৩৫৯; *সহীহ মুসলিম*, ২২৩৭; *নাসায়ী*, ২৮৮৫; *ইবনু মাজাহ*, ৩২২৮; *মুসনাদ আহমাদ*, ২৬৮১৯, ২৭০৭২; *দারিমী*, ২০০০; *রিয়াদুস সলিহীন*, ১৮৭২

الْأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ صحيح

> অর্থ : আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে একটি 'ওয়াযাগ' হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ সওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে এটি হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ সাওয়াব রয়েছে, যা প্রথম আঘাতে মারার তুলনায় কম। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ সওয়াব রয়েছে, যা দ্বিতীয় আঘাতে হত্যার চেয়ে কম।[১২৭]

عَنْ سَائِبَةَ، - مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا قَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الأَوْزَاغَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الأَرْضِ دَابَّةٌ إِلاَّ أَطْفَأَتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِهِ .

> অর্থ : ফাকিহা ইবনুল মুহীরার মুক্ত দাসী সাইবা থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা.)-র নিকট প্রবেশ করে তাঁর ঘরে একটি বর্শা রক্ষিত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনারা এটা দিয়ে কী করেন? তিনি বলেন, আমরা এই বর্শা দিয়ে এসব 'ওয়াযাগ' হত্যা করি। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন যে, ইবরাহিম (আ.)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো তখন পৃথিবীর বুকে এমন কোনো প্রাণী ছিল না, যা আগুন নেভাতে চেষ্টা করেনি, 'ওয়াযাগ' ব্যতীত। সে বরং আগুনে ফুঁ দিয়েছিল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ এটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[১২৮]

হাদিসে প্রাণীটির নাম হিসাবে 'الْوَزَغ' (ওয়াযাগ) শব্দটি এসেছে, যা হচ্ছে টিকটিকি বা গিরগিটি-জাতীয় একধরনের সরিসৃপ। কোনো কোনো অনুবাদক 'টিকটিকি' আবার কোনো কোনো অনুবাদক 'গিরগিটি' শব্দ দ্বারা অনুবাদ করেছেন। আমি এখানে 'গিরগিটি' অনুবাদটি ব্যবহার করছি। এই প্রাণীটির (Gecko) বহু প্রজাতি

---

[১২৭] *সহীহ মুসলিম; তিরমিযী; সুনান আবু দাউদ*, হাদিস নং : ৫২৬৩

[১২৮] *সুনান ইবন মাজাহ*, হাদিস নং : ৩২৩১

বিদ্যমান।[১২৯]

এ হাদিসগুলো পড়ে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ইবরাহিম (আ.) এর যুগে গিরগিটি যদি আগুনে ফুঁ দিয়েও থাকে, এই যুগে সে কারণে কেন গিরগিটি মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছে?

হাদিসের ব্যাখ্যায় মুফতি তাকি উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন,

> "আল্লাহই সব থেকে ভালো জানেন, আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে, ইবরাহিম (আ.) এর আগুনে ফুঁ দেওয়ার ঘটনা গিরগিটির অনিষ্টকারী স্বভাব বোঝাতে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে এর নিচু প্রকৃতিও বোঝানো হয়েছে। **একে মারতে আদেশ করার মূল কারণ হলো, এটি ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক প্রাণী। নতুবা ইবরাহিম (আ.) এর জমানায় ওই সকল গিরগিটির অন্যায়ের কারণে এ সকল গিরগিটিকে হত্যা করা, শাস্তি দেওয়া যুক্তিসংগত হতো না।** এ জন্য মূল কারণ তাদের কষ্টদান ও অবাধ্যাচরণ, যার বহিঃপ্রকাশ ইবরাহিম (আ.) এর ঘটনার সময়ে স্পষ্ট হয়ে যায়।"[১৩০]

শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বাজ (র.) এর মতে,

> "গিরগিটিকে হত্যা করা হবে **কারণ, সেটা কষ্টদানকারী প্রাণী।**"[১৩১]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাঈমিন (র.) এর মতে,

> "মানুষকে যে সকল প্রাণী মারার আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো ইহরাম অবস্থায় ও ইহরাম ছাড়াও মারা হবে। যেমন : গিরগিটি, বিচ্ছু ইত্যাদি। **হাদিসের মধ্যেই এসেছে যে এইগুলো কষ্ট দানকারী প্রাণী। সীমালঙ্ঘনের (মানুষকে কষ্টদানের) ক্ষেত্রে এদের কোনো তুলনা নেই।**"[১৩২]

অন্যান্য আলেমদের থেকেও এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[১৩৩] অতএব আমরা

---

[১২৯] ■ "Gecko _ reptile _ Britannica.com"
https://www.britannica.com/animal/gecko
■ "The Many Types Of Geckos - Tail and Fur"
https://tailandfur.com/the-many-types-of-geckos/
■ "Dangerous of Wild Animals_ Gecko"
http://dangerous-wild-animals.blogspot.com/2010/10/gecko.html

[১৩০] *তাকমিলা ফাতহিল মুলহিম*, ৪/৩৫০

[১৩১] *ইবরিযিয়্যা*, ২/৮৭ [শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বাজ (র.)]

[১৩২] *শারহু সহীহ বুখারী*, ৫/৫৭৩ [শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাঈমিন (র.)]

[১৩৩] দেখুন : *বাজলুল মাজহুদ*, ২০/২০২, [খলিল আহমেদ শাহারানপুরী]; *তুহফাতুল কারী*, ৪/৫২৮ [মুফতি পালনপুরী]; *যাখিরাতুল উকবাহ শারহ নাসাঈ*, ২৫/৮ [মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আদাম ইবন মুসা]; *ফাতহুল বারী*, ৪/৪১ [ইবন হাজার আসকালানী]

দেখলাম, হাদিসের ব্যাখ্যাকারকদের মতে, গিরগিটি মারতে আদেশ দেবার মূল কারণ এর ক্ষতিকর প্রকৃতি। একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেবার বিধান ইসলামে নেই, একের কর্মের ভার অন্য কেউ বহন করে না। আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

অর্থ : "বলো, "আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রভু অনুসন্ধান করব, অথচ তিনি সবকিছুর প্রভু?" **আর প্রত্যেক সত্তা স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে, কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না।**..."[১৩৪]

مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ : "যারা সৎ পথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য তা অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং **কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না;** আমি [আল্লাহ] রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দিই না।"[১৩৫]

গিরগিটির (Gecko) অনিষ্টকর হবার ব্যাপারটি আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত। আমেরিকান গবেষক Sonia Hernandez এ-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, গিরগিটিতে একধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে (enteric bacteria) যেটি এন্টিবায়োটিককে প্রতিরোধ করতে পারে।[১৩৬] কোনো ব্যাকটেরিয়া যদি এন্টিবায়োটিককে প্রতিরোধ করতে পারে, তাহলে সেটি মারাত্মক স্বাস্থ্য-ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে। Sonia Hernandez এর এই গবেষণা *Science of the Total Environment* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।[১৩৭] গিরগিটি কামড় দেয় এবং এর দ্বারা

---

[১৩৪] *আল কুরআন*, আন'আম, ৬ : ১৬৪

[১৩৫] *আল কুরআন*, বনী ইস্রাঈল (ইসরা), ১৭ : ১৫

[১৩৬] "Geckos resistant to antibiotics, may pose risk to pet owners, study finds -- ScienceDaily"
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150514141039.htm

[১৩৭] Christine L. Casey, Sonia M. Hernandez, Michael J. Yabsley, Katherine F. Smith, Susan Sanchez. **The carriage of antibiotic resistance by enteric bacteria from imported tokay geckos (Gekko gecko) destined for the pet trade.** *Science of The Total Environment*, 2015; 505: 299 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.102
[https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048969714014247]

ক্ষতিকর রোগ ছড়াতে পারে।[১৩৮] আমেরিকায় ঘর-বাড়িতে গিরগিটি প্রতিপালনের চল রয়েছে। ২০১৫ সালে গৃহপালিত গিরগিটির দ্বারা সেখানকার ১৬টি অঙ্গরাজ্যে ভয়ানক salmonella ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ দেখা দেয়।[১৩৯] কাজেই গিরগিটিকে একেবারে 'নিরীহ' প্রাণী বলবার কোনো সুযোগ নেই।

হাদিসে ইবরাহিম (আ.) এর আগুনে গিরগিটির ফুঁ দেবার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ দৃষ্টান্তটি দেখিয়ে দাবি করতে পারে যে, হাদিসে তো 'কারণ' হিসাবে ইবরাহিম (আ.) এর আগুনে ফুঁ দেবার ঘটনা উল্লেখ আছে; ক্ষতিকর হওয়ার কথা তো বলা হয়নি! এর জবাবে আমরা বলব : গিরগিটির ক্ষতিকর প্রাণী হবার বিষয়টি অন্যত্র বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ لِلْوَزَغِ « الْفُوَيْسِقَةُ »

অর্থ : আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ 'ওয়াযাগ' (গিরগিটি/ Gecko) সম্পর্কে বলেন : **তা ক্ষতিকর প্রাণী।**[১৪০]

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا صحيح

অর্থ : আমির ইবনু সা'দ (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ গিরগিটি মারার হুকুম করেছেন। **তিনি এর নাম দিয়েছেন অনিষ্টকারী।**[১৪১]

কাজেই এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে বিনা কারণে গিরগিটি হত্যা করতে বলা হয়েছে। আর ইবরাহিম (আ.) এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দেবার দৃষ্টান্ত উল্লেখের দ্বারাও এটা প্রমাণ হয় না যে ওই সময়ের গিরগিটিদের কর্মের জন্য এখনকার গিরগিটিদের মারতে বলা হয়েছে।

---

[১৩৮] ■ "Why You Don't Want to Get Bitten by A Tokay Gecko _ Tokay Gecko Guide"
http://tokaygeckoguide.com/why-you-dont-want-to-get-bitten-by-a-tokay-gecko/1603/
■ "Gecko Bite" (Reptile Magazine)
http://www.reptilesmagazine.com/Lizard-Care/Lizard-Bite/

[১৩৯] "Geckos Linked to Dangerous Salmonella Outbreak in 16 States - ABC News"
https://abcnews.go.com/Health/geckos-linked-dangerous-salmonella-outbreak-16-states/story?id=31069405

[১৪০] *সহীহ বুখারী*, ১৮৩১; *সহীহ মুসলিম*, ২২৩৯; *সুনান নাসাঈ*, ২৮৮৬; *মুসনাদ আহমাদ*, ২৪০৪৭, ২৪৬৮৯, ২৫৮০০, ২৫৮৫০

[১৪১] *সহীহ মুসলিম; মুসনাদ আহমাদ; সুনান আবু দাউদ*, হাদিস নং : ৫২৬২

একটা উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। ধরা যাক, কোনো একটি ডাকাত-দল বহু বছর ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে। ডাকাত-দলের কয়েক জন সদস্য ১০ বছর আগে একজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে ফেলল। এটি তাদের একটি ভয়াবহ জঘন্য কর্ম হিসাবে দৃষ্টান্ত হয়ে গেল। ঘটনার ১০ বছর পরে তাদের অনিষ্টকর স্বভাবের বিবরণ দিয়ে উল্লেখ করা হলো, "এই ডাকাত-দলকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এরা এমন লোক, যারা পুলিশ মারে!"—কেউ কি বলবে যে এই কথাটি ভুল?

কখনোই না। ডাকাত-দলের সকল সদস্য হয়তো কাজটি করেনি, কাজটি হয়তো সাম্প্রতিক সময়েও হয়নি। কিন্তু বহু আগের ওই কর্মটি তাদের ক্ষতিকর স্বভাবের একটি উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। এ কারণে তাদের ওই বিশেষ কাজটিকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে এভাবে তাদের গ্রেপ্তারের কথা বলা যেতেই পারে।

একই ভাবে, ইবরাহিম (আ.) এর সময়ে করা গিরগিটির একটি অনিষ্টকর কাজকে বর্তমান সময়ের গিরগিটিদের বেলাতেও অনিষ্টকর স্বভাবে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা যেতেই পারে।

হাদিসে কেন এক আঘাতে মারলে বেশি সওয়াবের কথা বলা হলো? এটি কি আসলেই গিরগিটির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন?

সংশ্লিষ্ট হাদিসের ব্যাখ্যায় ইজজুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম (র.) [৫৭৭-৬৬০ হি.] বলেছেন,

> **"প্রথম আঘাতে (গিরগিটি) মারার আদেশ দেবার কারণ হলো, তাকে এক আঘাতে হত্যা করা হলে উত্তম (সদয়)ভাবে হত্যা করা হবে** এবং এই হাদিসের আওতায় আমল করা হবে : রাসুল ﷺ বলেছেন, ''অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর ওপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরি) করেছেন। সুতরাং যখন হত্যা করো তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা করো এবং যখন (পশু) জবাই করো তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে জবাই করো।' [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯৫৫]..."[১৪২]

অর্থাৎ এ আদেশের সাথে নিষ্ঠুরতার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং দয়ার সম্পর্ক আছে। ক্ষতিকর প্রাণী বিধায় গিরগিটিকে মারতে বলা হয়েছে। এর প্রতি জুলুম করার জন্য মারতে বলা হয়নি। একে মারলেও এমনভাবে মারতে হবে যাতে এর কষ্ট কম হয়।

---

[১৪২] *আওনুল মা'বুদ*, পৃষ্ঠা : ২৩৮২

ইসলাম দয়ার ধর্ম, শান্তির ধর্ম। মানুষ, পশু-পাখি সকল কিছুর প্রতি দয়া প্রদর্শন হচ্ছে ইসলামের বিধান। মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন না হলে ইসলাম কোনো প্রাণী হত্যা করার বিধান দেয় না। পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারেও ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে।

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, 'এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হলো। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করালো। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।'

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, **'প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।'**[১৪৩]

তিনি বলেন, 'দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারও (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।'[১৪৪]

তিনি এক সাহাবীকে বলেন, 'তুমি যদি তোমার বকরির প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।'[১৪৫]

বিনা কারণে কোনো জীবকে কষ্ট দেবার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলাকে আযাব দেওয়া হয়েছে; যাকে সে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে মারাও গিয়েছিল। সে যখন তাকে (বিড়ালটিকে) বেঁধে রেখেছিল তখন খেতেও দেয়নি ও পান করতেও দেয়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ ধরে খেত।'[১৪৬]

এক ব্যক্তি তার উটকে ঠিকমতো খেতে দিয়ো না, উপরন্তু কষ্ট দিত। তার পাশ দিয়ে রহমতের রাসুল ﷺ-কে পার হতে দেখে উটটি আওয়াজ দিল এবং তার

---

[১৪৩] *সহীহ বুখারী*, হা/ ২৪৬৬; *সহীহ মুসলিম*, হা/২২৪৪

[১৪৪] *মুসনাদ আহমাদ*, ২/৩০১; *সুনান আবু দাউদ*, ৪৯৪২; *তিরমিযী, ইবন হিব্বান, সহীহুল জা'মে*, হা/৭৪৬৭

[১৪৫] হাকিম, *সহীহ তারগীব*, ২২৬৪

[১৪৬] *সহীহ বুখারী*, হা/ ২৩৬৫, ৩৪৮২

চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি উটের মালিককে ডেকে বললেন, **'তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন?** ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ভুখা রাখো এবং কষ্ট দাও!'[১৪৭]

ইসলামে অযথা কোনো পশু-পক্ষীকে কষ্ট দেওয়া, সাধ্যের অতীত কোনো পশুকে বোঝা বহনে বাধ্য করতে মারধর করা বৈধ নয়। পশু-পক্ষী কিছু অনিষ্ট করে ফেললে, গরু-মহিষ গাড়ি বা হাল টানতে অক্ষম হয়ে পড়লে অতিরিক্ত প্রহার করে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া বৈধ নয়।

একবার ইবন উমার (রা.) কুরাইশের একদল তরুণের নিকট পার হয়ে (কোথাও) যাচ্ছিলেন; সে সময় তারা একটি পাখি অথবা মুরগিকে বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তির ছুড়ে হাতের নিশানা ঠিক করা শিক্ষা করছিল। ... ওরা ইবন উমার (রা.)-কে দেখতে পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। ইবন উমার (রা.) বললেন, 'কে এ কাজ করেছে? যে এ কাজ করেছে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। অবশ্যই **আল্লাহর রাসুল ﷺ সেই ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জীবকে (অকারণে) নিশানা বানায়।**[১৪৮]

একবার রাসুল ﷺ একটি গাধার পাশ দিয়ে পার হলেন। গাধাটির মুখে দাগার দাঁগ দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, যে একে দেগেছে।'[১৪৯]

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অধিকার ছাড়া (অযথা) একটি বা তার বেশি চড়ুই হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে চড়ুই সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।'[১৫০]

রাসুল ﷺ বলেছেন, একবার একটি গাছের নিচে একজন নবীকে পিঁপড়া কামড়ে দিলে তিনি গর্তসহ পিঁপড়ার দল পুড়িয়ে ফেললেন। আল্লাহ তাঁকে ওহী করে বললেন, ''তোমাকে একটি পিঁপড়া কামড়ে দিলে তুমি একটি এমন জাতিকে পুড়িয়ে মারলে, যে (আমার) তাসবিহ পাঠ করত?...'[১৫১]

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে

---

[১৪৭] *মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ, হাকিম, সিলসিলাহ সহীহাহ,* হা/২০

[১৪৮] *সহীহ বুখারী,* হা/ ৫৫১৫; *সহীহ মুসলিম,* হা/১৯৫৮

[১৪৯] *সহীহ মুসলিম,* হা/২১১৬

[১৫০] *সুনান নাসাঈ, সহীহ তারগীব,* ২২৬৬

[১৫১] *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,* হা/২২৪১

কোনো মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হলো) সেই ব্যক্তি, যে কোনো লোককে মজদুরি খাটায়, অতঃপর তার মজুরি আত্মসাৎ করে এবং **(তৃতীয় হলো) সেই ব্যক্তি, যে অযথা পশু হত্যা করে।**'[১৫২]

আরও একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, গিরগিটি যদি ক্ষতিকর প্রাণীই হয়ে থাকে, একে যদি মেরেই ফেলতে হবে—তাহলে আল্লাহ একে কেন সৃষ্টি করলেন?

১. বিভিন্ন অনিষ্টকর বস্তু এবং জীব-জন্তু থাকার কারণে মানুষ আল্লাহর নিকট বিভিন্ন যিকির (স্মরণ) ও দোয়ায় অভ্যস্ত হতে পারে, যারা দ্বারা সে সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়।

২. এর মাঝে আল্লাহর অসামান্য সৃষ্টি-নৈপুণ্যের প্রমাণ ও নিদর্শন রয়েছে। ক্ষুদ্র প্রাণী গিরগিটি মানুষকে অনেক বড় ক্ষতি করতে পারে। আবার এর চেয়ে বৃহৎ প্রাণী উট মানুষকে কোনো ক্ষতি করে না। এর মাঝে মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৩. মানুষ পৃথিবীর এসব কষ্টদায়ক প্রাণীর দ্বারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়াতে যদি এদের থেকে কষ্টকর রোগ-ব্যাধি হতে পারে, তাহলে আখিরাতের শাস্তি কত কঠোর! আল কুরআন ও হাদিসে জাহান্নামে সাপ-বিচ্ছুর আযাবের কথা বলা হয়েছে।

৪. মানুষ জানবে যে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোনগুলো কল্যাণকর। সেগুলোর জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করবে। আর যেগুলো কষ্টদায়ক, সেগুলো থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে।

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম, ইসলামে কোনোভাবেই বিনা কারণে জীব-জন্তু হত্যা করা জায়েজ নয়। যারা গিরগিটি হত্যার হাদিস দেখিয়ে ইসলামকে নিষ্ঠুর ও বর্বর ধর্ম হিসাবে দেখাতে চায়, তারা ভুলের মধ্যে আছে। গিরগিটি ও অন্য সকল প্রাণী সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অসাধারণ হিকমতের পরিচয় রয়েছে। সুতরাং যাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে, তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

---

[১৫২] *হাকিম, বাইহাকী, সহীহুল জা'মে,* হা/ ১৫৬৭
ইসলামে জীবে দয়া ও এ সকল বিষয়ে দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই বইটি দেখুন : *ইসলামী জীবন-ধারা*, [আবদুল হামীদ ফাইযী]
ডাউনলোড লিঙ্ক : https://bit.ly/2ygp14g

"কুরআন ও সুন্নাহ" নাকি "কুরআন ও আহলে বাইত"?

প্রশ্ন : হাদিসশাস্ত্র যদি নির্ভরযোগ্য হতো, তাহলে এতে স্ববিরোধিতা পাওয়া যায় কেন?

বিদায় হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি, যা হাজার হাজার মানুষ একই সময়ে শুনেছিল , সেই ভাষণ থেকে ১টি-২টি নয়; বরং ৩টি পরস্পরবিরোধী সহীহ হাদিস পাওয়া যায়!!!

১. আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবকে (কুরআন) রেখে গেলাম, যদি তোমরা এটাকে আঁকড়ে থাকো, তবে কখনো বিপথগামী হবে না। *[মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ]*

২. আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও আমার সুন্নাহকে রেখে গেলাম, যদি তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকো, তবে কখনো বিপথগামী হবে না। *[মুয়াত্তা]*

৩. আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও আমার পরিবারকে (আহলে বাইত) রেখে গেলাম,... *[মুসলিম , আহমাদ, দারিমি]*

হাজার হাজার সমবেত মুসলমান শোনার পরেও একই কথার ৩টি ভার্সন পাওয়া যায় কেন? একই ঘটনার হাদিস থেকে আহলে কুরআনরা (Quranist) ১নং ভার্সন গ্রহণ করেছে, সুন্নীরা নিজেদের স্বার্থে ২নং ভার্সন গ্রহণ করেছে আর শিয়ারা ওদের স্বার্থ অনুযায়ী ৩নং ভার্সন গ্রহণ করেছে। কাজেই হাদিস কি আদৌ ইসলামি শরিয়তের গ্রহণযোগ্য উৎস হতে পারে?

উত্তর : ওপরে যে হাদিসগুলোর কথা বলা হলো, এর সবগুলোই সহীহ হাদিস। অতএব সবগুলোই নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু হাদিসগুলো দেখিয়ে যে 'স্ববিরোধিতার'(?) কথা বলা হলো, এখানে কিছু শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। এই শুভঙ্করের ফাঁকি ব্যবহার করে প্রতিবছর মহররম মাস আসলেই শিয়াদের দেখা যায় হাদিসশাস্ত্র নিয়ে কটু কথা বলতে। তাদের দাবি—সুন্নীরা নাকি ষড়যন্ত্র করে আহলে বাইতের কথা বাদ দিয়ে সুন্নাহর কথা ঢুকিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। নাস্তিক-মুক্তমনা আর খ্রিষ্টান মিশনারিদেরও দেখা যায় শিয়াদের পালে হাওয়া দিয়ে হাদিসশাস্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে। যা হোক, এখানে শুভঙ্করের ফাঁকিটা বের করা যাক।

এখানে ৩টা হাদিসেরই 'মাতান' (মূল অর্থ) এ মিল আছে, ৩টা হাদিসেই কমনভাবে আল্লাহর কিতাব বা আল কুরআনের কথা বলা আছে। এই মিলকে কাজে লাগিয়েই ইসলামের শত্রুরা সরলপ্রাণ মুসলিমদের বোঝাতে চায় যে, ৩টা হাদিসই একই ঘটনার ব্যাপারে এবং এগুলোতে পরস্পরবিরোধী তথ্য আছে। কিন্তু আসলেই কি হাদিসগুলো একই ঘটনার ব্যাপারে? এটি জানতে আমাদের চলে যেতে হবে নবী ﷺ-এর বিদায় হজের ঘটনায়।

এখন যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হবে, তাতে কিছু তারিখ উল্লেখ থাকবে। পড়বার সময় তারিখগুলো ভালো করে খেয়াল করুন। তাহলে ইসলামের শত্রুদের শুভঙ্করের ফাঁকি ধরা সহজ হবে।

নবী ﷺ ১০ম হিজরী সনে যিলকদ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে বিদায় হজের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। দিনটি ছিল শনিবার।[১৫৩] আবার হজের সকল কার্যাবলি শেষ করে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে রওনা দেন ১৪ই যিলহজ বুধবার।[১৫৪] মাঝের এই দিনগুলোতে দিনে বেশ কয়েক বার জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন বলে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে।[১৫৫]

যিলহজ মাসের ৮ তারিখ অর্থাৎ তারবিয়ার দিন নবী ﷺ মিনায় গমন করেন এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে দিনে বাত্বনে ওয়াদিতে গমন করেন। সেখানে জনতার উদ্দেশে একটি ভাষণ প্রদান

---

[১৫৩] ▪ *ফাতহুল বারী*, ইবন হাজার আসকালানী (র.), ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১০৪;
▪ *আর রাহিকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.) [তাওহীদ পাবলিকেশন্স], পৃষ্ঠা : ৫২১

[১৫৪] ▪ *যাদুল মাআদ*, ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ (র.), ২/২৭৫
▪ *সীরাতুর রাসূল (ছা.)*, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৭২৫

[১৫৫] *সীরাতুর রাসূল (ছা.)*, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৭০২-৭২৫ দ্রষ্টব্য; ভাষণগুলো এখানে পাওয়া যাবে।

করেন।[১৫৬] সেই ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি কথা ছিল :

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ

অর্থ : "আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনো পথহারা হবে না এবং **তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআন)**।"[১৫৭]

হজের মূল কার্যক্রম ও ঈদুল আযহা শেষ হয়ে যাবার পরে আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোতেও নবী ﷺ কিছু ভাষণ দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন, আইয়ামে তাশরিকের মধ্যবর্তী (বা ২য়) দিনে অর্থাৎ ১২ই যিলহজ তারিখে মিনায় সুরা নাসর নাযিল হয়। অতঃপর তিনি ক্বাছওয়া (القَضْواء) উটনীতে সওয়ার হয়ে জামরায়ে আক্বাবায় গমন করেন। অতঃপর কংকর নিক্ষেপ শেষে ফিরে এসে জনগণের উদ্দেশে তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণটি প্রদান করেন।"[১৫৮]

১২ যিলহজ তারিখের এই ভাষণে নবী ﷺ যেসব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

অর্থ : ''হে লোকসকল, আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা মজবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। **আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর নবীর সুন্নাহ**।"[১৫৯]

হজের সকল বিধি-বিধান পালন করার পর ১৪ই যিলহজ বুধবার মসজিদুল হারামে ফজরের সলাত আদায়ের পর রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হয়ে যান।[১৬০] পথে রাবেগের নিকটবর্তী খুম কুয়ার নিকট পৌঁছালে বুরাইদা

---

[১৫৬] *আর রাহিকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.) [তাওহীদ পাবলিকেশন্স], পৃষ্ঠা : ৫২২

[১৫৭] *সহীহ মুসলিম*, নবীর ﷺ হজ অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৯৭

[১৫৮] ▪ *বায়হাকি*, ৫/১৫২, হা/৯৪৬৪; *আবু দাউদ*, হা/১৯৫২ 'মানাসিক' অধ্যায়, ৭১ অনুচ্ছেদ; *আলবানী*, সনদ সহীহ; *আওনুল মা'বূদ*, হা/১৯৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
▪ *সীরাতুর রাসূল (ছা.)*, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৭২২

[১৫৯] ▪ *হাকিম*, হা/৩১৮, সহীহ
▪ *সীরাতুর রাসূল (ছা.)*, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৭২৩-৭২৪

[১৬০] ▪ *যাদুল মা'আদ*, ২/২৭৫
▪ *সীরাতুর রাসূল (ছা.)*, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৭২৫

আসলামী (রা.) রাসুল ﷺ-এর নিকটে আলী (রা.) এর ব্যাপারে গনিমত বণ্টন-সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কথা বলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল ﷺ সাহাবীদের সামনে কিছু বক্তব্য পেশ করেন। এই বক্তব্যের মধ্যকার কিছু অংশ ছিল :

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ

: « أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ « فَحَثَّعَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُاللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي»

অর্থ : রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি 'খুম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নাসিহত করলেন। অতঃপর বললেন : শোনো হে লোকসকল, আমি তো কেবল একজন মানুষ, অতি সত্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আসবেন, আর আমিও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেব। **আমি তোমাদের নিকট ২টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব** (কুরআন)। এতে পথনির্দেশ এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো। তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন, **আর [অন্যটি হলো] আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক)**। আর আমি আহলে বাইতের (অধিকারের) বিষয়ে তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।..."[১৬১]

ওপরে ৩টি হাদিসই বর্ণনা করা হলো। ঘটনাগুলো সংঘটিত হবার তারিখও উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুল ﷺ শুধু আল কুরআন রেখে যাবার কথা বলেছেন যিলহজ মাসের ৮ তারিখের ভাষণে, সেখানে তিনি কুরআনের বিধান অনুসরণ করতে বলেছেন। ১২ যিলহজ তারিখের ভাষণে নবী ﷺ কুরআন ও সুন্নাহ এই ২টি জিনিসের কথা বলেছেন এবং এই ২টি জিনিসকে অনুসরণ করতে বলেছেন। হজের কার্যাবলি শেষ

---

[১৬১] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৪০৮

করে ১৪ই যিলহজ মদীনার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন এবং পথে খুম নামক স্থানে বক্তৃতায় কুরআন ও আহলে বাইত রেখে যাবার কথা বলেছেন; কুরআন অনুসরণ করতে বলেছেন এবং আহলে বাইতের অধিকারের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমরা দেখলাম যে এগুলো আসলে ১ ঘটনা নয়; বরং ৩টি পৃথক পৃথক ঘটনা। প্রত্যেকটিই সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। ১ম ২টি ঘটনায় তিনি কুরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন, ৩য় ঘটনায় কুরআনের বিধানকে অনুসরণ করতে বলেছেন এবং আহলে বাইতের অধিকারের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অনুসরণ করবার জন্য তিনি মোট ২টি জিনিস রেখে গেছেন আর তা হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। ১ম ঘটনায় তিনি অনুসরণীয় ১টি জিনিসের (কুরআন) কথা উল্লেখ করেছেন, ২য় ঘটনায় উভয়টির (কুরআন ও সুন্নাহ) কথাই উল্লেখ করেছেন। ৩য় ঘটনায় তিনি পুনরায় কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আহলে বাইতের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ৩টি পৃথক ঘটনায় রাসুল ﷺ এই কথাগুলো বলেছেন। এগুলো মোটেও একই ঘটনার ৩টি আলাদা ভার্সন নয়। সুন্নীরা মোটেও ষড়যন্ত্র করে কোনো কিছু বাদ দেয়নি, এই সকল হাদিস সুন্নী ইমামদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থেই আছে। এবং এগুলোর মধ্যে কোনো পরস্পরবিরোধিতা নেই। অতএব যারা পরস্পরবিরোধিতা(!) ও 'ষড়যন্ত্রের'(!) ভুয়া অভিযোগ তুলে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছিল, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

> "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[১৬২]

> "...রাসুল [মুহাম্মাদ ﷺ] তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো।..."[১৬৩]

---

[১৬২] *আল কুরআন*, আহযাব, ৩৩ : ২১

[১৬৩] *আল কুরআন*, হাশর, ৫৯ : ৭

কুরআনে কি আসলেই খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে ভুল তথ্য আছে?

কুরআন নিয়ে যেন ইসলামের শত্রুদের অভিযোগের অন্ত নেই। যেসব মিথ্যা অভিযোগ তারা তোলে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুরআনে ত্রিত্ববাদ (trinity) সম্পর্কিত তথ্য। ইসলামবিরোধীদের দাবি হচ্ছে : কুরআনের লেখক খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে জানতেন না, কুরআনে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদকে নাকি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। তারা বলে, কুরআনে বলা হয়েছে খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ ঈশ্বর, যিশু [ঈসা (আ.)] ও মরিয়ম (আ.)-কে নিয়ে গঠিত। অথচ খ্রিষ্টানরা এভাবে ত্রিত্বে বিশ্বাস করে না; তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ত্রিত্ব (trinity) ঈশ্বর (Father), যিশু (Son) ও পবিত্র আত্মাকে (Holy Spirit) নিয়ে গঠিত।

এই দাবির স্বপক্ষে তারা কুরআনের সুরা মায়িদাহর ১১৬নং আয়াত উপস্থাপন করে :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

অর্থ : যখন আল্লাহ বললেন : **হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদের বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত করো?** ঈসা বলবেন : আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে

জ্ঞাত।[১৬৪]

লক্ষ করুন, এ আয়াতে সরাসরি ত্রিত্ব/তিন এ রকম কোনো কথা নেই। এখানে শুধু খ্রিষ্টানদের দ্বারা ঈসা (আ.) ও মরিয়ম (আ.) এর উপাসনা করার কথা বলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আয়াত চেক করতেই আল কুরআনের ভুলের (?) ব্যাপারে খ্রিষ্টান ও নাস্তিক-মুক্তমনাদের ভ্রান্ত দাবির অসারতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কুরআন কী বলে?

পবিত্র কুরআনে মোট ২টি আয়াত পাওয়া যায়, যাতে ত্রিত্ববাদের কথা আলোচিত হয়েছে। চলুন দেখি সে আয়াতগুলোতে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে।

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> অর্থ : **নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে : আল্লাহ তিনের এক;** অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।”[১৬৫]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

> অর্থ : হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সংগত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বোলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম-পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ, তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রাসূলগণকে মান্য করো। **আর এ কথা বোলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো;** তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।[১৬৬]

---

[১৬৪] *আল কুরআন*, মায়িদাহ, ৫ : ১১৬; অনুবাদ : মুহিউদ্দিন খান

[১৬৫] *আল কুরআন*, মায়িদাহ, ৫ : ৭৩ ; অনুবাদ : মুহিউদ্দিন খান

[১৬৬] *আল কুরআন*, নিসা, ৪ : ১৭১; অনুবাদ: মুহিউদ্দিন খান

আমরা দেখতে পাচ্ছি, ত্রিত্ববাদ-সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে মোটেও মরিয়ম (আ.) এর কথা উল্লেখিত নেই!

কুরআনে ত্রিত্ববাদ-বিষয়ক তথ্যে ভুল আছে—নাস্তিক ও খ্রিষ্টান প্রচারকদের এই অভিযোগটি তাই মোটেই সঠিক নয়।

বিরোধীরা হয়তো বলবেন, সরাসরি ত্রিত্বের কথা না থাকলেও কুরআন তো সুরা মায়িদাহর ১১৬নং আয়াতে দাবি করছে খ্রিষ্টানরা মরিয়মের উপাসনা করে। এই তথ্য কতটুকু সঠিক? কোনো খ্রিষ্টান কি মরিয়ম (আ.) এর নিকট প্রার্থনা করে?

এর উত্তরে আমরা মুসলিমরা যা বলব তা হচ্ছে—কুরআনের তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক।

বর্তমান পৃথিবীতে খ্রিষ্টানদের যে দল বা ফির্কা আছে, তার মধ্যে সব থেকে বড় ও প্রধান ৩টি দলের দুটি দল হচ্ছে ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স চার্চ।[১৬৭] এই ২ দলের বিশ্বাস হচ্ছে : মরিয়ম হচ্ছেন ঈশ্বরের মা (Mother of God)।[১৬৮]

শুধু তা-ই নয়, ত্রিত্বের অংশ মনে না করলেও এরা মূর্তি সহযোগে মরিয়মের নিকট প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের নিকট সুপারিশকারী হিসাবে বিশ্বাস করে।[১৬৯] ইসলামের দৃষ্টিতে এটি শির্ক বলে বিবেচিত।

---

[১৬৭] "How Many Christians Are In the World Today –Thought Co."
https://www.thoughtco.com/christianity-statistics-700533

[১৬৮] ■ "Theotokos - Wikipedia"
https://en.wikipedia.org/wiki/Theotokos
■ "Mary, Mother of God - Catholic Online"
http://www.catholic.org/mary/
■ "Orthodox Tradition and Mary _ University of Dayton, Ohio"
https://udayton.edu/imri/mary/o/orthodox-tradition-and-mary.php

[১৬৯] ■ "Why the Orthodox Honor Mary" - Fr. Stephen Freeman (Glory to God for All Things)
https://blogs.ancientfaith.com/glory2godforallthings/2015/07/30/why-the-orthodox-honor-mary/
■ "The Holy Tradition and the Veneration of Mary and other Saints in the Orthodox Church" - Very Reverend John Morris (Antiochian Orthodox Christian Archdiocese)
http://www.antiochian.org/node/17079

চিত্র : গির্জার ভেতর যিশু ও মরিয়মের মূর্তির সামনে প্রার্থনারত খ্রিষ্টান পোপ[১৭০]

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুরআন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছে, তা বর্তমান সময়ের খ্রিষ্টানদের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে কোনো কোনো মুসলিম মুফাসসির যেমন সুদ্দী (র.) সুরা মায়িদাহর ৭৩নং আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেছেন, খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ব বলতে মাসিহ ঈসা (আ.), তাঁর মা [মরিয়ম (আ.)] এবং আল্লাহকে মিলিয়ে বলত।[১৭১] যদিও কুরআনে সরাসরি এই কথা বলা নেই।

যদি এটিও বিবেচনা করা হয় যে, কুরআনে মরিয়ম (আ.)-কে ত্রিত্ব বা ট্রিনিটির অংশ বলা হয়েছে, তাহলেও সেটিকেও "কুরআনের ভুল" বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়।

কারণ, খ্রিষ্টবাদের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো। এ দুই হাজার বছরের ইতিহাসে খ্রিষ্টানদের মধ্যে অজস্র দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে।[১৭২] প্রাচীন ও মধ্যযুগে হাজার হাজার খ্রিষ্টান দল ছিল যেগুলো বর্তমানে নেই [যেমন : Basilidians,

---

[১৭০] ■ যদিও মূর্তি বোঝা যাচ্ছে কিন্তু আসল মানুষের মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় এমন কোনো ছবি ছাপানো পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো না।
খ্রিষ্টানদের মরিয়মের নিকট প্রার্থনার আরও অনেক ছবি এই লিংক থেকে দেখা যেতে পারে :
https://goo.gl/4BHNls
■ "Saint Worship and Mary worship" (You Tube)
https://www.youtube.com/watch?v=UHjL6eBkYLM অথবা শর্ট লিংক : https://bit.ly/2Pv3Pjo

[১৭১] *তাফসির ইবন কাসির*, ৪র্থ খণ্ড (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী), সুরা মায়িদাহর ৭৩ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ৭২১

[১৭২] শুধু বর্তমান বিশ্বেই খ্রিষ্টানদের মধ্যে ৩৩,০০০ এরও বেশি দল-উপদল রয়েছে।
"The Facts and Stats on 33000 Denominations - World Christian Encyclopedia (2001, 2nd edition)" [Evangelical Catholic Apologetics]
http://www.philvaz.com/apologetics/a106.htm

carpocratians, Ebionites]। আবার বর্তমান যুগে অনেক দল আছে যা ২০০ বছর আগেও ছিল না [যেমন : Jehovah's Witness, Mormon]।[১৭৩]

খ্রিষ্টবাদের প্রাচীন যুগ থেকে এমন কিছু দল ছিল, যারা মরিয়মকে তাদের ত্রিত্বের অংশ বলে বিশ্বাস করত। Mariamites নামক এক খ্রিষ্টান-দলের পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের ত্রিত্ব গঠিত ছিল পিতা (ঈশ্বর), পুত্র (যিশু) ও মাতাকে (মরিয়ম) নিয়ে।[১৭৪]

Washington Irving ও Hugh Griffith এর মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনীমূলক বই *Mohammed*-এ উল্লেখ করা হয়েছে :

> **The Mariamites, or worshippers of Mary, regarded the Trinity as consisting of God the Father, God the Son, and God the Virgin Mary.**
>
> **The Collyridians were a sect of Arabian Christians,** composed chiefly of females. **They worshipped the Virgin Mary as possessed of divinity, and made offerings to her** of a twisted cake, called collyris, whence they derived their name.[১৭৫]

অর্থাৎ, Mariamite গণ পিতা, পুত্র ও মাতা [ঈশ্বর, মরিয়ম, যিশু] এই ত্রিত্বে বিশ্বাসী ছিল। এ ছাড়া **Collyridian নামে আরব অঞ্চলে একটি খ্রিষ্টান-দল ছিল, যারা কুমারী মরিয়মকে পূজা করত ও তাঁর জন্য উৎসর্গ করত।**

William Cook Taylor এর *Reading in Biography: A Selection of the Lives of Eminent Men of All Nations* বইতে উল্লেখ আছে,

> "In Arabia itself some of the worst heresies were propagated: the chief of these were the heresies of the Ebonites, the Nazareans, **and the Collydrians, the last of which derived its name from the collyris, or twisted cake offered by them to the Virgin Mary, whom they worshipped as a deity.** It is known to all readers of ecclesiastical history that **a sect called Mariamites exalted the Virgin to a participation in the**

---

[১৭৩] প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত কী বিপুল পরিমাণ খ্রিষ্টান দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে এবং কালের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে, এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে এই আর্টিকেলটি থেকে :
"List of Christian denominations - Wikipedia"
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations

[১৭৪] "Brewer's : Mariamites - Infoplease"
https://www.infoplease.com/dictionary/brewers/mariamites

[১৭৫] *Mohammed*, Washington Irving & Hugh Griffith, Page 47
গুগল বুক লিংক : https://goo.gl/3cz8y1

Godhead, and that writers of the Romish Church have named her the 'complement of the Trinity.'….”[১৭৬]

অর্থাৎ, আরবে Collydrian ভ্রান্ত খ্রিষ্টান-দল ছিল। এদের নাম এসেছে **মরিয়মের প্রতি তারা যে পিঠা উৎসর্গ করত,** তা থেকে। **তারা মরিয়মকে উপাস্য হিসাবে পূজা করত। Mariamites একটি দল ছিল, যারা সেই কুমারী (মরিয়ম)-কে এমন স্তুতি করত, যেন সে ঈশ্বরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রোমঘেষা চার্চের লেখকেরা তাঁকে “ত্রিত্বের পূর্ণতা” হিসাবে উল্লেখ করেছেন।**

John William Draper তাঁর *History of the Conflict Between Religion and Science* বইতে লিখেছেন,

“In the east, in consequence of the policy of the court of Constantinople, the Church had been torn in pieces by contentions and schisms. Among a countless host of disputants may be mentioned Arians, Basilidians, Carpocritains, Collydrians, Eutychians, Gnostics, Jacobites, Marcionites, Marionites, Nestorians, Sabellians, Vallentians. **Of these the Marionites regarded the Trinity as consisting of God the Father, God the Son, and God the Virgin Mary; the Collydrians worshipped the Virgin as a divinity, offering her sacrifices of cakes….”**[১৭৭]

অর্থাৎ, পূর্বের চার্চগুলোর মধ্যে **Marionites গণ ত্রিত্বকে পিতা, পুত্র এবং কুমারী মরিয়ম—এভাবে বিবেচনা করত। Collydrian গণ সেই কুমারী (মরিয়ম)-কে উপাস্য হিসাবে পূজা করত, তাঁর উদ্দেশে কেক উৎসর্গ করত।**

Edward Gibbon তাঁর *The History of The Decline & Fall Of The Roman Empire* এ উল্লেখ করেছেন,

The Christians of the seventh century had insensibly relapsed into a semblance of paganism: their public and private vows were addressed to the relics and images that disgraced the temples of the East: the throne of the Almighty was darkened by the clouds of martyrs, and saints, and angels, the objects

[১৭৬] *Reading in Biography: A Selection of the Lives of Eminent Men of All Nations,* William Cooke Taylor, Page 192
গুগল বুক লিংক : https://bit.ly/2OMEbBf

[১৭৭] *History of the Conflict Between Religion and Science,* John William Draper , Page 79
লিংক : https://archive.org/details/historyofconflic1875drap/page/78

of popular veneration; **and the Collyridian heretics, who flourished in the fruitful soil of Arabia, invested the Virgin Mary with the name and honours of a goddess.**[১৭৮]

অর্থাৎ, ৭ম শতাব্দীর খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেক রকমের পৌত্তলিকতা ছিল। **সে সময়ে আরবে 'Collyridian' নামে একটি ভ্রান্ত খ্রিষ্টান-দল ছিল, যারা কুমারী মরিয়মকে একজন দেবী হিসাবে ভক্তি করত।**

Vanderbilt University Divinity School এর New Testament studies বিষয়ের অধ্যাপক Amy-Jill Levine এ ব্যাপারে বলেছেন,

> "**There are even stronger hints that Mary was venerated as a goddess.** By the fourth century, Epiphanius (315-403 CE) was ordering the faithful **not to worship Mary** but only the Father, Son and Holy Spirit, suggesting that such activity had been transpiring for a while."[১৭৯]

অর্থাৎ, **মরিয়মকে যে দেবীরূপে পূজা করা হতো এ ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী ইঙ্গিত পাওয়া যায়।** ৪র্থ শতকে বিশপ এপিফ্যানিয়াস বিশ্বাসী **খ্রিষ্টানদের মরিয়মের উপাসনা করতে নিষেধ করেন** এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার উপাসনা করতে বলেন।

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ জর্জ সেল (George Sale) তার কুরআন অনুবাদের প্রারম্ভিক আলোচনায় উল্লেখ করেছেন :

> But, to be more particular as to the nation we are now writing of, **Arabia was of old famous for heresies**; which might be in some measure attributed to the liberty and independency of the tribes. Some of the Christians of that nation believed the soul died with the body, and was to be raised again with it at the last day: these Origen is said to have convinced. Among the Arabs it was that the heresies of Ebion, Beryllus, and the Nazareans, **and also that of the Collyridians, were broached, or at least propagated; the latter introduced the Virgin Mary for God, or worshipped her as such offering her a sort of twisted cake called collyris, whence the sect had its name.**

---

[১৭৮] *The History of The Decline & Fall Of The Roman Empire*, Edward Gibbon, Page 135
লিংক : https://archive.org/details/declinefallofrom03gibbuoft/page/134

[১৭৯] *A Feminist Companion to Mariology*, Amy-Jill Levine & Maria Mayo Robbins, Page 173

This notion of the divinity of the Virgin Mary was also believed by some at the Council of Nice, who said there were two gods besides the Father viz. Christ and the virgin Mary, and were thence named Mariamites. Others imagined her to be exempt from humanity, and deified; which goes but little beyond the popish superstition in calling her the complement of the Trinity, as if it were imperfect without her. This foolish imagination is justly condemned in the Koran as idolatrous, and gave a handle to Mohammed to attack the Trinity itself.[১৮০]

অর্থাৎ, প্রাচীন আরবের বিভিন্ন ভ্রান্ত খ্রিষ্টান-দলের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি **Collyridian দের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা কুমারী মরিয়মকেও ঈশ্বরের মতো পূজা করত।** এ ছাড়া খুব প্রাচীন আরেকটি খ্রিষ্টান-দলের কথা উল্লেখ করেছেন, নাইসিয়ার সম্মেলনের সময়েও (৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ) যাদের অস্তিত্ব ছিল। **তারা বিশ্বাস করত, পিতা (স্বর্গীয় ঈশ্বর) বাদেও আরও ২ জন উপাস্য আছে। যিশু এবং কুমারী মরিয়ম।** এই খ্রিষ্টান-দলটি Mariamite নামে পরিচিত ছিল।

সুরা নিসার ১৭১নং আয়াতের **[“...আর এ কথা বোলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো...”]** আলোচনায় জর্জ সেল বলেছেন,

Namely, God, Jesus and Mary. For the eastern writers mention a sect of Christians which held the Trinity to be composed of those three; but it is allowed that this heresy has been long since extinct. **The passage, however, is equally levelled against the Holy Trinity,** according to the doctrine of the orthodox Christians, who, as Al Beidawi acknowledges, believe the divine nature to consist of three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost; by the Father, understanding God›s essence, by the Son, his knowledge, and by the Holy Ghost, his life.

অর্থাৎ, তার মতে এখানে ঈশ্বর, যিশু এবং মরিয়মের কথা বলা হয়েছে। **কারণ, প্রাচ্যের লেখকেরা একটি খ্রিষ্টান-দলের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের ত্রিত্ব (Trinity) এই তিন জন নিয়ে গঠিত ছিল।** কুরআনের এই অংশটি খ্রিষ্টানদের Holy Trinity (অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা) এর আলোচনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে

---

[১৮০] *The Koran*, George Sale, Page 25
লিংক : https://archive.org/details/historyofconflic1875drap/page/78

প্রয়োগযোগ্য।[১৮১]

Reverend Gilbert Reid D.D বলেছেন,

> "As to **Christianity as it was represented in Arabia, it was not a clear untarnished theism, but tritheism. The Heavenly Father, Mary the mother of God and Jesus their son, were WORSHIPPED as three Gods, and their images appeared in the churches along with the images of other saints.** Christianity as taught by Christ had lost its identity in the formalism and errors of the church of Arabia. Still more the truths pro-claimed by God through all the ages had been lost sight amid the vain imaginings of men's hearts. The only God of, an omnipresent spirit, without form or body. The reformation of Mohammed was thus a return to the first and second commandment of the Prophet Moses, which Jesus himself had taught."[১৮২]

অর্থাৎ, আরবে প্রচলিত খ্রিষ্টবাদ ছিল তিন জন আলাদা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্ম। স্বর্গীয় পিতা, ঈশ্বরের মাতা মরিয়ম এবং তাদের পুত্র যিশুকে তিন জন ঈশ্বর হিসাবে পূজা করা হতো এবং গির্জার মধ্যে সাধুদের সাথে সাথে তাদের ছবিও শোভা পেত।

এ ছাড়া John Henry Blunt D.D,[১৮৩] Erich Fromm,[১৮৪] Charles H. H.

---

[১৮১] *The Koran*, George Sale, Page 80
লিংক : https://archive.org/details/koranoralcoranof00sale/page/80

[১৮২] *The Biblical World*, Gilbert Reid, Volume. 48, Number. 1, Page 12

[১৮৩] "In Accordance with which are the statements of certain writers, logically in agreement with the worship they advocate, that **St. Mary has been assumed into the Trinity, so as to make it a quaternity, that Mary is the 'compliment of the Trinity."**
From: *Dictionary of Doctrinal and Historical Theology edited*, John Henry Blunt, Page 441
https://archive.org/details/cu31924100630668/page/n453

[১৮৪] "In the Nestorian controversy a decision against Nestorius was reached in 431 **that Mary was not only the mother of Christ but also the mother of God, and at the end of the fourth century there arose a cult of Mary, and men addressed prayers to her.** About the same time the representation of Mary in the plastic arts also began to play a great and ever-increasing role. The succeeding centuries attached more and more significance to the mother of God, and her worship became more exuberant and more general. Altars were erected to her, and her pictures were shown everywhere."
From: *The Dogma of Christ: And Other Essays on Religion, Psychology and Culture* Erich Fromm, Page 62-63

Wright[১৮৫] সহ আরও অনেক বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টধর্মের প্রাচীনকাল থেকেই কয়েকটি দল ছিল, যারা কুমারী মরিয়মের উপাসনা করত এমনকি মরিয়মকে সরাসরি ত্রিত্বের অংশ হিসাবে বিশ্বাস করত।

আরবে সে সময়ে মরিয়মকে এবং যিশুকে আলাদা উপাস্য হিসাবে পূজা করা এবং ত্রিত্বের মধ্যে মরিয়মকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারটি বিভিন্ন অমুসলিম উৎস থেকেও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কাজেই আল কুরআনে যদি শুধু সেই যুগের খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে উল্লেখ করে ত্রিত্বের মধ্যে মরিয়মকে শামিল করা হয়, ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোকে সেটিও সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য। নিঃসন্দেহে এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী বহু খ্রিষ্টান সেই প্রাচীন যুগ থেকে ছিল। তবে কুরআনে কোথাও সরাসরি ত্রিত্বের মাঝে মরিয়মকে শামিল করা হয়নি; বরং সুনির্দিষ্টভাবে "তিনের এক" বা ত্রিত্বের উপাসনা করতে নিষেধ করে এক-অদ্বিতীয় ইলাহের উপাসনা করতে বলা হয়েছে। যিশু [ঈসা (আ.)] এবং মরিয়ম (আ.) এর উপাসনা করতে নিষেধ করে শুধু আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে এই সাধারণ ব্যাপারগুলোর উল্লেখ আছে। কুরআনে এমন ভাষারীতিতে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীন এবং বর্তমান—সকল সময়ের খ্রিষ্টানদের জন্যই এগুলো প্রযোজ্য হচ্ছে।

এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তাতে এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যায় :

১. কুরআনে ত্রিত্ববাদ-সংক্রান্ত আয়াতে সরাসরি এটি বলা নেই যে, মরিয়ম (আ.) ত্রিত্বের অংশ।

২. কুরআনে খ্রিষ্টানদের মরিয়ম (আ.) এর উপাসনার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ যথার্থ অভিযোগ। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ খ্রিষ্টান

---

[১৮৫] "St. Epiphanius, Bishop of Constantia, in Cyprus, writing in the fourth century against the Collyridians, says, " After this a heresy appeared, which we have already mentioned slightly by means of the letter written in Arabia about Mary. And this heresy was again made public in Arabia from Thrace and the upper parts of Scythia, and was brought to our ears, which to men of understanding will be found ridiculous and laughable. We will begin to trace it out, and to relate concerning it. It will be judged (to partake of) silliness rather than of sense, as is the case with others like it. For, as formerly, out of insolence towards Mary, those whose opinions were such sowed hurtful ideas in the reflexions of men, so likewise these, leaning to the other side, fall into the utmost harm. **For some women deck out a Kovplkòv, that is to say, a square stool, spreading upon it a linen cloth, on some solemn day of the year, for some days they lay out bread, and offer it in the name of Mary.** All the women partake of the bread, as we related in the letter to Arabia, writing partly about that.
From: *A Protestant dictionary, containing articles on the history, doctrines, and practices of the Christian church,* Charles H. H. Wright , Page 393
https://archive.org/details/aprotestantdicti00wriguoft/page/392

এই কাজে লিপ্ত। তারা মরিয়ম (আ.) এর কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করে এবং এর সামনে প্রার্থনা করে।

৩. যদি এটিও ধরে নেওয়া হয় যে, কুরআনে উল্লেখিত ত্রিত্ববাদে মরিয়ম (আ.) অন্তর্ভুক্ত—সেটিও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য।

৪. কুরআনে খ্রিষ্টানদের যিশু [ঈসা (আ.)] এবং মরিয়ম (আ.) এর উপাসনা পরিত্যাগ করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনার আহ্বান জানানো হয়েছে। কুরআনের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যথার্থ।

তাই যারা কুরআন থেকে ভুল বের করতে যায়, তারা নিজেরাই বিশাল এক ভুলের মধ্যে নিপতিত আছে। আল্লাহ্ এই অজ্ঞতা ও বিপথগামিতা থেকে সকলকে রক্ষা করুন।

> "মরিয়মের পুত্র মাসিহ [ঈসা (আ.)] একজন রাসুল ছাড়া আর কিছুই নয়; তাঁর পূর্বে আরও বহু রাসুল গত হয়েছে, আর তাঁর মা [মরিয়ম (আ.)] একজন পরম সত্যবাদিনী, তাঁরা উভয়ে খাদ্য আহার করত। লক্ষ করো! আমি কীরূপে তাদের নিকট প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি। আবার লক্ষ করো! তারা উল্টো কোনো দিকে যাচ্ছে?
>
> বলো, "তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করবে, যা তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে না? আর আল্লাহ্, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"
>
> বলো, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি কোরো না এবং এতে ওই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।"[১৮৬]

---

[১৮৬] *আল কুরআন*, মায়িদাহ, ৫ : ৭৫-৭৭

আল্লাহ কী করে শেষরাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসতে পারেন, যেখানে পৃথিবীর সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় শেষরাত থাকে?

নাস্তিক প্রশ্ন : হাদিসে বলা আছে আল্লাহ নাকি শেষ রাতে নিকটতম আসমানে আসেন। আধুনিক যুগে আমরা জানি যে, সব সময়েই পৃথিবীর সব স্থানেই কখনো না কখনো 'শেষরাত' চলে। তাহলে আল্লাহ কীভাবে শেষরাতে অবতরণ করেন? আল্লাহ কি তাহলে সব সময়েই নিকটতম আসমানে থাকেন? তিনি তাহলে কখন ও কীভাবে আরশের ওপরে থাকেন? এটা কি আদৌ কোনো যৌক্তিক কথা?

উত্তর : মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব। তিনি শোনেন ও জানেন, আমরা যা প্রকাশ করি আর যা গোপন করি। বান্দার কোনো ডাকই তাঁর জানার বাইরে নয়। তিনি সর্বাবস্থায় আমাদের আকুতি শোনেন। তবে কিছু সময় আছে, যখন দুআ করলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তেমনই একটা সময়ের কথা আমরা জানতে পারি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদিসে :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَه مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه

অর্থ : "**প্রতিরাতে যখন রাতের শেষ-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন আমাদের মহিমান্বিত মহা-কল্যাণময় প্রতিপালক নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন।** তিনি বলেন : আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে

ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[১৮৭]

আসমান ও জমীনের রব হয়েও আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাকে এভাবে ডাকাটা একজন মুমিনের হৃদয়কে বিগলিত করে দেয়। তবে অন্ধকারে যাদের বসবাস, তারা সবকিছুতেই অন্ধকার খুঁজে বেড়ায়। তাই এ হাদিস নিয়েও তাদের কুযুক্তির শেষ নেই।

চলুন দেখা যাক, আলেমরা এ হাদিস সম্পর্কে কী বলেছেন।

মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসকে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত (গুণ/বিশেষণ)-বিষয়ক হাদিস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন :

> "...**এই হাদিস এবং আরও এই ধরনের যে সমস্ত হাদিসে আল্লাহর সিফাত বা প্রত্যেক রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে আল্লাহ্ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সে সকল হাদিস সম্পর্কে একাধিক বিশেষজ্ঞ আলিমের বক্তব্য হলো, এই ধরনের রিওয়ায়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে।** এসব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং তা কী ধরনের সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যাবে না। ইমাম মালিক ইবন আনাস, সুফিয়ান ইবন উআয়না, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) প্রমুখ ইমামদের থেকে এই ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে। এই ধরনের হাদিসগুলো সম্পর্কে তাঁরা বলেন, "কী ধরনের?", সে প্রশ্ন না তুলে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে সেভাবেই তা মেনে নাও। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু জাহমিয়া সম্প্রদায় এই সমস্ত রিওয়ায়াত অস্বীকার করে ; তারা বলে, এগুলো হলো উপমাবোধক। ... এটি এমন, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন : "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয় ; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (৪২ : ১১)।[১৮৮]

অতএব, মহান আল্লাহর অন্য একটি বিশেষণ 'নুযুল' বা অবতরণ। এ সিফাত বা বিশেষণটিকে কিছু প্রাচীন পথভ্রষ্ট ফির্কা জাহমিয়া ও মুতাযিলারা অস্বীকার করত। তাদের বক্তব্য : স্থান পরিবর্তন আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি আরশ থেকে অবতরণ করলে আরশ কি শূন্য থাকে? তারা আরও বলে : অবতরণ অর্থ নৈকট্য বা বিশেষ করুণা।[১৮৯]

---

[১৮৭] *সহীহ বুখারী*, ১/৩৮৪; *সহীহ মুসলিম*, ১/৫২২

[১৮৮] *তিরমিযী শরীফ*, ৩য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৬৫৯ নং হাদিসের আলোচনা, পৃষ্ঠা : ৪০

[১৮৯] *ইমাম আবু হানিফা (র.) এর 'ফিকহুল আকবার' বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা* – ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র.), পৃষ্ঠা : ২৬৩

নাস্তিকদের প্রশ্নও এই পথভ্রষ্ট ফির্কাগুলোর ন্যায়। প্রকৃতপক্ষে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে চিন্তা করাটাই একটা ভুল চিন্তা। স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনো এক নয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে চিন্তা করাটা একটা ত্রুটিপূর্ণ ও দূষিত চিন্তা।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে ইমাম আবু জাফর তহাবী (র.) বলেন :

> **"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।** অতএব, যে ব্যক্তি এতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে সে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের মতো নিরর্থক কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।"[১৯০]

কাজেই আল্লাহ তা'আলাকে মানুষ বা সৃষ্টিজগতের মাত্রা বা dimension থেকে চিন্তা করাটা কোনো ইসলামী বিশ্বাস নয়। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ব্যাপারে ইসলামী বিশ্বাস কী?

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (র.) [১৯৫ হি.] বলেন :

سألت الأوزاعى ومالكا والثورى والليث بن سعد عن الأحاديث التى فيها الصفة فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف

> "ইমাম আওযায়ী (র.) [১৫৭ হি.], ইমাম মালিক ইবন আনাস (র.) [১৭৯ হি.], ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) এবং ইমাম লাইস ইবন সা'দ (র.) [১৭৫ হি.]-কে আমি **মহান আল্লাহর বিশেষণ (সিফাত) বিষয়ক হাদিসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।** তখন তাঁরা বলেন : **এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে নাও; কোনোরূপ স্বরূপ-প্রকৃতি ব্যতিরেকে।**"[১৯১]

ইমাম আবু হানিফার (র.) অন্যতম প্রধান ছাত্র প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শাইবানী (র.) [১৮৯ হি.] বলেন :

> "পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল দেশের ফকীহগণ সকলেই একমত যে, মহান আল্লাহর বিশেষণ (সিফাত) সম্পর্কে কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো বিশ্বাস করতে হবে, কোনোরূপ পরিবর্তন, বিশেষীকরণ এবং তুলনা ব্যতিরেকে। যদি কেউ বর্তমানে সেগুলোর কোনো

---

[১৯০] *আকিদা তহাবিয়া*, ইমাম আবু জাফর তহাবী (র.), আকিদা নং ৩৪

[১৯১] ইবন হাজার আসকালানী (র.), *ফাতহুল বারী*, ১৩/৪০৭

কিছু ব্যাখ্যা করে তবে সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগকারী এবং উম্মতের পূর্বসূরিদের ইজমার (ঐকমত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত। কারণ, তারা এগুলোর বিশেষীকরণ করেননি এবং ব্যাখ্যাও করেননি; বরং তারা কুরআন ও সুন্নাহতে যা বিদ্যমান তার ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়েছেন এবং এরপর নীরব থেকেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি জাহম [জাহমিয়া ফির্কার প্রতিষ্ঠাতা]-এর মত গ্রহণ করবে সে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ঐকমত্যের পথ পরিত্যাগ করবে; কারণ, সে মহান আল্লাহকে নেতিবাচক ও অবিদ্যমানতার বিশেষণে বিশেষীকরণ করে।"[১৯২]

আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ অন্যান্য বিশেষণের মতো আল্লাহ তা'আলার 'অবতরণ' সিফাতটিকেও তুলনামুক্তভাবে মেনে নেন। তিনি যখন এবং যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির অবতরণের মতো নয়। তাঁর অবতরণের স্বরূপ ও প্রকৃতি কী তা আমরা জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে মহান আল্লাহর অবতরণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন :

ينزل بلا كيف

"(মহান আল্লাহ) অবতরণ করেন, কোনোরূপ পদ্ধতি বা স্বরূপ ব্যতিরেকে।"[১৯৩]

সহীহ বুখারীতে সিফাত-সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.) এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ইবন রজব হাম্বলী (র.) :

"...আমি আবু আব্দুল্লাহকে [আহমাদ বিন হাম্বল (র.)] বললাম, **"আল্লাহ কি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"** আমি বললাম, "তাঁর অবতরণ কি ইলম (জ্ঞান) দিয়ে অথবা কী দিয়ে?" তিনি বললেন, "এই বিষয়ে চুপ করো। তোমার কী দরকার এ বিষয়ে? হাদিসে যেভাবে 'কীভাবে' বা সীমা ছাড়া বর্ণিত হয়েছে সেভাবে মেনে নাও। তবে কোনো আছার বা হাদিস যদি বর্ণিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। অথবা যদি কিতাবে বর্ণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, **"অতএব, আল্লাহর কোনো সদৃশ সাব্যস্ত কোরো না।"** (সুরা নাহল, ১৬ : ৭৪) এরপরে ইবন রজব হাম্বলী (র.) উল্লেখ করেছেন, **"(আল্লাহর)**

---

[১৯২] সায়িদ নাইসাপূরী, *আল-ই'তিকাদ*, পৃ. ১৭০; লালকায়ী, *ই'তিকাদ*, ৩/৪৩২; যাহাবী, *আল-উলু*, পৃ. ১৫৩

[১৯৩] বাইহাকী, *আল-আসমা ওয়াস সিফাত*, ২৩৮০; মোল্লা আলী কারী আল হানাফী, *শারহুল ফিকহিল আকবার*, পৃ. ৬৯

'অবতরণ' বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তার ওপর নড়াচড়া, স্থানান্তর, আরশ থেকে খালি হওয়া, না থাকা এ সকল কিছু সাব্যস্ত করা বিদআত। এ ব্যাপারে গভীরে অনুসন্ধান করা কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়।"[১৯৪]

কুরআনে এটিও বলা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর 'ইস্তাওয়া' করেছেন।

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

"পরম করুণাময় (আল্লাহ), আরশের ওপর ইস্তাওয়া করেছেন।"[১৯৫]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) বলতেন—

"মহান আল্লাহ আরশের ঊর্ধ্বে ইস্তাওয়া করেছেন। 'ইস্তাওয়া' অর্থ তিনি এর ঊর্ধ্বে। মহান আল্লাহ আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে এবং সকল কিছুর ওপরে। এখানে আরশকে উল্লেখ করার কারণ, আরশের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কিছুর মধ্যে নেই। তা হলো আরশ সবচেয়ে মর্যাদাময় সৃষ্টি এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে। মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি আরশের উপর ইস্তাওয়া করেছেন, অর্থাৎ তিনি আরশের ঊর্ধ্বে। আরশের উপর ইস্তাওয়ার অর্থ আরশ স্পর্শ করে অবস্থান করা নয়। মহান আল্লাহ এরূপ ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে।"[১৯৬]

ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর ওসীয়াত গ্রন্থে লিখেছেন,

"আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর ইস্তাওয়া গ্রহণ করেন, আরশের প্রতি তাঁর কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের ওপরে স্থিরতা-উপবেশন ব্যতিরেকে। তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না; বরং তিনি মাখলুকের মতো পরমুখাপেক্ষী হতেন। আর যদি তাঁর আরশের ওপরে উপবেশন করার প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই আল্লাহ এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।"[১৯৭]

ইমাম আযম আবু হানিফার (র.) এ বক্তব্য উল্লেখ করে মোল্লা আলী কারী হানাফী

---

[১৯৪] *ফাতহুল বারী*, ইবন রজব হাম্বলী (র.), ৯ম খণ্ড, ২৮০-২৮১ পৃষ্ঠা

[১৯৫] *আল কুরআন*, ত্ব-হা, ২০ : ৫

[১৯৬] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.), *আল-আকিদাহ*, আবু বকর খাল্লালের বর্ণনা; পৃষ্ঠা : ১০২-১১১

[১৯৭] ইমাম আবু হানিফা (র.), *আল-ওয়াসিয়্যাহ*, পৃ. ৭৭

(র.) বলেন : "এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র.) খুবই ভালো কথা বলেছেন। তাঁকে আল্লাহর আরশের উপরে ইস্তাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন :

الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب

> **"ইস্তাওয়া পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত,** এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরি।"[১৯৮]

আল্লাহর সত্তা যেমন সৃষ্টির মতো নয়, তেমনি তার বিশেষণাবলিও সৃষ্টির মতো নয়। সকল মানবীয় কল্পনার ঊর্ধ্বে তাঁর সত্তা ও বিশেষণ। কাজেই মহান আল্লাহর আরশের উপরে ইস্তাওয়া এবং নিকটতম আসমানে অবতরণ উভয়ই সত্য এবং মুমিন উভয়ই বিশ্বাস করেন। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করা মানবীয় সীমাবদ্ধতার ফসল। তদুপরি জাহমিয়াদের এ বিভ্রান্তি দূর করতে ইমামগণ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র.) বলেন :

الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان

> **"আল্লাহ আসমানে (ঊর্ধ্বে) এবং তার জ্ঞান সকল স্থানে।** কোনো স্থানই মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়।"[১৯৯]

ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ইমাম বাইহাকী (র.)।[২০০]

ইমাম কুতাইবাহ বিন সা'ঈদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ ২৪০ হি.) বলেন :

هذا قول الائمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه ، كما قال جل جلاله: (الرحمن على العرش استوى)

> অর্থ : "এটাই হচ্ছে ইসলামের এবং আস-সুন্নাহ ওয়াল জাম'আতের ইমামদের বক্তব্য যে : **আমরা আমাদের রবকে সপ্তম আসমানে আরশের ওপর আছেন বলে জানি,** যেমন মহিমাময় প্রতাপশালী বলেছেন : **"আর-রহমান আরশের ওপর ইস্তাওয়া করেছেন"** [সুরা ত্ব-হা, : ৫]।[২০১]

---

[১৯৮] মোল্লা আলী কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার,* পৃ. ৭০

[১৯৯] আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, *আস-সুন্নাহ,* ১/১০৭, ১৭৪, ২৮০; আজুররী, *আশ-শরীয়াহ,* ২২৪-২২৫; আব্দুল বার, *আত-তামহীদ,* ৭/১৩৮

[২০০] বাইহাকী, *আল-আসমা ওয়াস সিফাত,* ২/৩৩৭-৩৩৯

[২০১] *আল-উলু,* ইমাম যাহাবী (র.), বর্ণনা : ৪৭০

ইমাম আবু নাসর আস-সিজযি রহিমাহুল্লাহ (৪৪৪ হি.) তাঁর কিতাবুল ইবানাহতে বলেন :

فأئمتنا كسفيان الثورى ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وان علمه بكل مكان وانه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء

অর্থ : "এবং আমাদের ইমামগণ, যেমন সুফিয়ান আস-সাওরি, মালিক, সুফিয়ান বিন 'উয়াইনাহ, হাম্মাদ বিন সালামাহ, হাম্মাদ বিন যায়দ, আব্দুল্লাহ বিন আল-মুবারক, ফুদ্বাইল বিন ইয়াদ্ব, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন ইবরাহিম আল-হানযালি (রহিমাহুমুল্লাহ) এই ব্যাপারে একমত আছেন যে, **মহামহিম আল্লাহ তাঁর সত্তাসহ আরশের ওপরে আছেন এবং তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে রয়েছে** এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন আরশের ওপরে চক্ষুসমূহ দ্বারা দেখা যাবে **এবং তিনি নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন** এবং তিনি রাগান্বিত হন, যা চান তা দ্বারা কথা বলেন। সুতরাং যারা এর কোনো কিছু বিরোধিতা করবে, সে তাদের থেকে মুক্ত (সম্পর্কবিহীন) এবং তারা তার থেকে মুক্ত।"[২০২]

এ সকল দলিল ও ইজমার আলোকে দারুল উলুম দেওবন্দের ইফতা বিভাগের ফতোয়ায় বলা হয়েছে :

اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہوتے ہوئے ہرجگہ ہے یعنی سب چیز اس کی قدرت اور احاطۂ علم کے اندر ہے اس کے احاطۂ علم اور احاطۂ قدرت سے باہر نہیں ہے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ عرش پر کس طرح ہے جو اس شایانِ شان ہے اسی طرح عرش پر ہے ، ہمیں اس کا علم نہیں، نہ ہمیں اس ٹوہ میں پڑنا چاہیے، بس ایمان رکھنا چاہیے۔

অর্থ : **"আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর আছেন।** আরশের ওপর থেকেই তিনি সর্বত্র বিরাজমান, অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও কুদরাতের গণ্ডিতেই সবকিছু। কোনো কিছুই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। সকল মুফাসসিরের মতে **আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তিনি আরশের ওপর কীভাবে আছেন। তিনি তাঁর শান মোতাবেক আছেন।** যার আকার বা ধারণা আমাদের অজানা। আমাদের এ ব্যাপারে কোনো ইলম নেই। আর এসব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করা উচিত।

---

[২০২] দেখুন, *দারউত তাআরুদ* ৬/২৫০ এবং এ থেকে যাহাবী উদ্ধৃত করেছেন তাঁর *সিয়ার* ১৭/৬৫৬ এ

ব্যস, ইমান রাখাই যথেষ্ট আমাদের জন্য।"[২০৩]

আল কুরআনে বলা হয়েছে :

اللَّهُ الصَّمَدُ

অর্থ : "আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।"[২০৪]

ইমাম আবু জাফর তহাবী (র.) বলেন :

> "আর আরশ এবং কুরসী সত্য। আর **আল্লাহ তা'আলা আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী**। তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং **তিনি সবকিছুরই ঊর্ধ্বে**। সৃষ্টিজগৎ তাঁকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে অক্ষম।"[২০৫]

আল্লাহ তা'আলা স্থান ও সময়ের স্রষ্টা।[২০৬] তিনি এগুলোর মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি এগুলোর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কাজেই আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা খুবই সহজ যে আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে থাকবেন এবং শেষরাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করবেন। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সব সময়ে শেষরাত থাকলেও আল্লাহ তা'আলার জন্য তা কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলার আরশে ঊর্ধ্বারোহণ কিংবা শেষ-আসমানে অবতরণ মোটেও মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির মতো নয়। নাস্তিক-মুক্তমনা কিংবা পথভ্রষ্ট বিদআতী আকিদার মানুষেরা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে মিলিয়ে ফেলে ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সিফাত-সংক্রান্ত হাদিসে কোন প্রকারের অসংগতি বা অযৌক্তিক কিছু নেই।

এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[২০৩] দারুল উলুম দেওবন্দের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ফতোয়াটি দেখা যেতে পারে : http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Islamic-Names/155436

[২০৪] *আল কুরআন*, ইখলাস, ১১২ : ২

[২০৫] *আকিদা তহাবিয়া*, ইমাম আবু জাফর তহাবী (র.), আকিদা নং ৪৯-৫১

[২০৬] বিস্তারিত দেখুন : "He is asking about time is it created Will it exist in Paradise Will time cease to exist" – islamQa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) https://islamqa.info/en/205107

আল্লাহ : চন্দ্রদেবতা (Moon god) নাকি সারা জাহানের পালনকর্তা?

আপনি যদি একটি মতাদর্শকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে চান, তাহলে সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে এর উৎসমূল ধরে নাড়া দেওয়া। আপনি যদি উৎসমূলকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেন, ভিত্তিহীন প্রমাণ করতে পারেন, সেই মতাদর্শটি বিলীন হতে বাধ্য। ইসলামের বিরুদ্ধে এই কাজটিই করে যাচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা। দ্বীন ইসলামের উৎসমূল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি করে এরা মুসলিমদের সংশয়ে ফেলতে চাচ্ছে, ইসলামকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। ইসলাম ধর্মে মহান স্রষ্টা আল্লাহর ব্যাপারে এরা বিভিন্ন অভিযোগ ও তত্ত্ব উপস্থাপন করছে। এর মধ্যে অন্যতম 'জনপ্রিয়' তত্ত্ব হচ্ছে : আল্লাহ নাকি প্রাচীন আরবের চন্দ্রদেবতার (Moon god) নাম (নাউযুবিল্লাহ), মুসলিমরা নাকি না জেনে সেই চন্দ্রদেবতার উপাসনা করছে। আর এ কারণেই নাকি বিভিন্ন মসজিদের গম্বুজের ওপরে কিংবা বিভিন্ন মুসলিম দেশের পতাকায় এক ফালি চাঁদ (Crescent Moon) ও তারার ছবি দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলাকে Moon god প্রমাণ করতে এদের প্রচেষ্টা সত্যিই চোখে পড়ার মতো, ইন্টারনেটে এই কথা লিখে সার্চ দিলেই অজস্র আর্টিকেল চলে আসে। সম্প্রতি বঙ্গীয় নাস্তিক-মুক্তমনাদের কলমেও এই জিনিসটির আগমন লক্ষ করা যাচ্ছে।

আমরা এখন তাদের এই তত্ত্বের উৎস ও স্বরূপ সন্ধান করব। সেই সাথে এর আদৌ কোনো সত্যতা আছে কি না তাও যাচাই করব।

চন্দ্রদেবতা (Moon god) তত্ত্বের উৎপত্তি কীভাবে

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন থেকে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেছেন, তাঁর দাওয়াহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ শুরু হয়েছে। সে সময়ে তাঁকে জাদুকর, মিথ্যাবাদী, পাগলসহ অনেক কিছুই বলা হয়েছে। কালক্রমে এর সবকিছু ভুল প্রমাণিত হয়েছে, পরবর্তীকালে ইসলামের শত্রুরা নতুন নতুন অপবাদ ইসলামের ওপর আরোপ করেছে। এভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোখার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চন্দ্রদেবতা বা Moon god তত্ত্ব একটি একদম নতুন তত্ত্ব। বিভিন্ন পশ্চিমা গবেষক আল কুরআনে উল্লেখিত স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে প্রাচীন আরবের চন্দ্রদেবতার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে প্রচার করা শুরু করেন। সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক হুগো উইঙ্কলার (Hugo Winckler)। ১৯০১ সালে তিনি দাবি করেন যে, মক্কায় পূজিত হুবাল ছিল চন্দ্রদেবতা।[২০৭] সে সময়ে ড্যানিশ পণ্ডিত ডিটলেফ নিয়েলসেন (Ditlef Nielsen) ও আল কুরআনের আল্লাহকে পৌত্তলিক আরবের চন্দ্রদেবতার সাথে সংশ্লিষ্ট করে কিছু বইপত্র লেখেন।[২০৮] এর অনেক কাল পরে ১৯৯০ এর দশকে আমেরিকান খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা এই জিনিসটি আবার হালে পানি পায়। আমেরিকান খ্রিষ্টান প্রচারক রবার্ট মোরি (Robert Morey) ১৯৯২ সালে *The Islamic Invasion : Confronting The World's Fastest Growing Religion* নামে একটি বই লেখেন। এই বইয়ের মাধ্যমেই মূলত চন্দ্রদেবতা তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৯৪ সালে সেই বইটিকে ভিত্তি করে লেখা তার পুস্তিকা *The Moon-god Allah: In Archeology of the Middle East* দ্বারা এই তত্ত্ব আরও জনপ্রিয় হয়ে যায়।[২০৯] ওই বছরেই এই জিনিসটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে দেবার 'মহান' কাজটি করেন খ্রিষ্টীয় প্রচারযন্ত্রের আরেক মুখপাত্র কার্টুনিস্ট জ্যাক চিক (Jack Chick)। তার *Allah Had No Son* নামক গল্পধর্মী কার্টুন বা কমিকসের দ্বারা Moon god তত্ত্ব খ্রিষ্টীয় ও পশ্চিমা দুনিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে যায়।[২১০] এভাবেই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার

---

[২০৭] *Arabisch, Semitisch, Orientalisch: Kulturgeschichtlich-Mythologische Untersuchung,* Hugo Winckler, 1901, W. Peiser: Berlin, Page 83

[২০৮] এ বিষয়ে তার বেশ কিছু রচনা ছিল। যেমন :

- *Die Altarabische Mondreligion Und Die Mosaische Ueberlieferung* (১৯০৪ সালে প্রকাশিত; আর্কাইভ বুক লিংক : https://archive.org/details/diealtarabischem00nieluoft/page/n3)
- *Der Dreieinige Gott In Religionshistorischer Beleuchtung* (১৯২২ সালে প্রকাশিত; আর্কাইভ বুক লিংক : https://archive.org/details/derdreieinigegot01niel/page/n5)

[২০৯] দেখুন, *A History of Pagan Europe*, Prudence Jones, Nigel Pennick, Page 77

[২১০] '*Allah Had No Son*' - Jack T. Chick
https://www.slideshare.net/gabrieldnino/allah-had-no-son

দ্বারা ইসলামের উৎসমূলের বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রশ্নবিদ্ধ এক তত্ত্বে দাঁড় করা হয় গত শতকের' ৯০ এর দশকে। ধীরে ধীরে নাস্তিকসহ ইসলামের সকল সমালোচকদের মাঝেই এই তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইসলামের শত্রুদের অভিযোগ

আমরা আল্লাহ তা'আলার নামের চন্দ্রদেবতা অপবাদের উৎস নিয়ে আলোচনা করলাম। বর্তমানকালে যারা ইসলামের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে লেখালেখি করেন, তাদের সকলেরই তথ্যের উৎস হচ্ছে গত শতকের শুরুর দিককার এবং শেষে '৯০ এর দশকের সময়কালের লেখা বইগুলো। সে বইগুলোতে যেসব তত্ত্বের সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে চন্দ্রদেবতা বানানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো :

১. হুগো উইঙ্কলারের মতে, প্রাচীন আরবে মক্কায় যে হুবালের উপাসনা হতো, সে ছিল চন্দ্রদেবতা।[২১১] এর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে অনেক খ্রিষ্টীয় মিশনারি (যেমন স্যাম শামুন) এবং ইসলামবিরোধী নাস্তিকরা বলার চেষ্টা করে যে হচ্ছেন প্রাচীন মক্কার পৌত্তলিক দেবতা হুবাল (নাউযুবিল্লাহ)

২. খ্রিষ্টান মিশনারি রবার্ট মোরির মতে, আল্লাহ্ হচ্ছেন প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার চন্দ্রদেবতা সিন (Sin) এর আরবীয় সংস্করণ (নাউযুবিল্লাহ)

৩. আল্লাহ্ ছিলেন জাহিলিয়াতের যুগে মক্কার কা'বায় পূজিত ৩৬০ দেবতার এক দেবতা (নাউযুবিল্লাহ)

এই প্রস্তাবনাগুলোকে ভিত্তি ধরে এবং এর সাথে সম্পূরক আরও কিছু অভিযোগ সংযুক্ত করে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার চেষ্টা করে।

আল্লাহ (الله) শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ

আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নামটি এসেছে আরবি ক্রিয়াপদ আলাহা > ইয়া'লাহু > মা'লুহ (أَلَه يَألَه فهو مألوه) থেকে। এগুলোর মূলে রয়েছে আলিফ, লাম এবং হা এই

---

[২১১] Hugo Winckler: *Arabisch, Semitisch, Orientalisch: Kulturgeschichtlich-Mythologische Untersuchung*, 1901, W. Peiser: Berlin, p. 83.

৩টি হরফ। এই ক্রিয়ার অর্থের মধ্যে ভালোবাসা এবং উপাসনা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন একজন সত্তা, যিনি ভালোবাসা ও উপাসনার হকদার। যাঁর প্রতি বিশ্বাসীগণ আশা ও ভয় রাখেন, যাঁর জন্য স্তুতি করেন।[২১২] আরবি ভাষায় এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টাবোধক এক পবিত্র শব্দ এটি। অনন্য এই শব্দের কোনো বহুবচন বা বিপরীত লিঙ্গ নেই। Edward William Lane এর অভিধানে চমৎকারভাবে আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ উল্লেখ করা হয়েছে : " الله [Witten with the disjunctive alif الله, meaning God, i.e the only true god]"[২১৩]

অর্থাৎ 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা একমাত্র সত্য উপাস্যকে বোঝায়।

একই মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত শব্দ (Cognates) হিব্রু ও অ্যারামায়িকের মতো অন্যান্য সেমিটিক ভাষাগুলোতেও পাওয়া যায়।[২১৪] হিব্রু ভাষায় এর সমজাতীয় শব্দ 'এলোহিম' (אלהים) এবং 'এলোয়াহ' (אלוה), যা বাইবেলে পাওয়া যায়।[২১৫] বাইবেলীয় অ্যারামায়িক ভাষায় এর সমজাতীয় শব্দ 'এলাহা' (ܐܠܗܐ) এবং অ্যারামায়িকের একটি উপভাষা সিরিয়াকে এর উচ্চারণ হয় 'আলাহা' (ܐܲܠܵܗܵܐ)।[২১৬]

'আল্লাহ' শব্দের অর্থের মাঝে চন্দ্র বা এ রকম কোনো কিছুর সম্পর্ক নেই।

---

[২১২] ■ "...The blessed name "Allaah" is derived from the Arabic verb alaha/yalahu/malooh [the root of which is the three letters alif, laam, haa]. This verb includes the meaning of love as well as worship. Allaah, may He be glorified and exalted, is the One Who is loved, glorified and feared by the believers, and they put their hope in Him."
From: "Doubts of one who is interested in Islam – IslamQA (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)"
https://islamqa.info/en/1930/
■ *মুখতারুস সিহাহ*, যাইনুদ্দিন ইবন আবি বাকর আর রাজি আল হানাফী, ১/২০

[২১৩] Edward William Lane, *An Arabic-English Lexicon* (London: Willams & Norgate, 1863), under the entry "Allah"

[২১৪] ■ *Columbia Encyclopaedia* says: Derived from an old Semitic root referring to the Divine and used in the Canaanite El, the Mesopotamian ilu, and the biblical Elohim and Eloah, the word Allah is used by all Arabic-speaking Muslims, Christians, Jews, and other monotheists.
■ "Allah _ Encyclopedia.com"
https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/islam/islam/allah

[২১৫] "Allah _ Encyclopedia.com"
https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/islam/islam/allah

[২১৬] ■ The Comprehensive Aramaic Lexicon – Entry for 'lh
■ "Allah – Wikipedia"
https://en.wikipedia.org/wiki/Allah#Etymology

হুবাল এবং আল্লাহ কি এক?

প্রাচীন আরবে মক্কায় যে হুবালের উপাসনা হতো তাকে চন্দ্রদেবতা বলে অভিহিত করেছিলেন হুগো উইঙ্কলার। এই তথ্যকে ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টীয় মিশনারি এবং ইসলামবিরোধী নাস্তিকরা মুসলিমদের এই বলে আক্রমণ করে যে, মুসলিমরা জেনে বা না জেনে হুবাল দেবতার উপাসনা করছে। হুবাল নাকি চন্দ্রদেবতা আর সেই চন্দ্রদেবতাই নাকি আল্লাহ! (নাউযুবিল্লাহ)

প্রথম কথা

কোনো দাবি পেশ করতে হলে এর স্বপক্ষে প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। হুবাল যে চন্দ্রদেবতা এ ব্যাপারে আদৌ কোনো প্রমাণ নেই। এটি ইসলামের শত্রুদের নিজস্ব উক্তি ছাড়া কিছুই নয়। ইসলামী ইতিহাসের কোনো প্রাথমিক উৎসে (primary source) এটা বলা নেই প্রাচীন মক্কায় পূজিত হুবাল ছিল চন্দ্রদেবতা। মক্কা ও এর আশপাশের অঞ্চলের দেব-দেবীদের বিবরণের ব্যাপারে প্রাথমিক উৎসের একটি হচ্ছে হিশাম ইবন কালবী (র.) এর *কিতাবুল আসনাম*। এই গ্রন্থে হুবাল দেবতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। হুবাল দেবতাকে মক্কার পৌত্তলিকরা ভাগ্য গণনার কাজ ব্যবহার করত। হুবালের মূর্তির সামনে গিয়ে তারা তির নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা চালাত।[২১৭] চাঁদের সাথে এর কোনো সংযোগের উল্লেখই নেই।

দ্বিতীয় কথা

আল্লাহকে মক্কার মানুষেরা বহু আগে থেকে উপাসনা করত এবং সারা জাহানের প্রভু বলে বিশ্বাস করত। তাদের ধর্মবিশ্বাস এমন ছিল। তারা আল্লাহকে মূর্তি দিয়ে প্রকাশ করা কোনো দেবতা বলে বিশ্বাস করত না।[২১৮]

কিন্তু হুবাল দেবতার পূজা তাদের মধ্যে কীভাবে এল?

মক্কায় কীভাবে হুবাল দেবতার পূজা শুরু হয়, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট বেশ কিছু তথ্য রয়েছে। হুবাল দেবতাকে মোটেও কা'বা ঘর স্থাপনের সূচনা থেকে পূজা

---

[২১৭] *কিতাবুল আসনাম*, হিশাম ইবন কালবী (র.) [*The Book Of Idols* শিরোনামে ইংরেজিতে অনূদিত] পৃষ্ঠা : ২১-২২
https://archive.org/details/KitabAlAsnam/page/n19

[২১৮] এ বিষয়ে একটু পরেই "*আল্লাহ সম্পর্কে মক্কার পৌত্তলিক আরবদের বিশ্বাস : আল্লাহ কি আসলেই ৩৬০ দেবতার একজন ছিলেন?*" এই পয়েন্টের ভেতর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

করা হতো না; বরং এর পূজা অনেক পরে শুরু হয়। এমনকি হুবাল মক্কার কোনো নিজস্ব দেবতাও ছিল না; বরং তা বাইরে থেকে মক্কায় আমদানি হয়েছে। এবং কাজটির সূচনা করেছিল আমর বিন লুহাই নামে এক ব্যক্তি।

আরবের মানুষজন ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) এর সময় থেকে এক আল্লাহর উপাসনা করত। দীর্ঘদিন তারা একত্ববাদী ইবরাহিমী ধর্মের ওপরেই ছিল। বনু খুযা'আহ গোত্রের সর্দার 'আমর বিন লুহাই এর ধর্মীয় মতাদর্শের লালন ও পরিপোষণ, দান-খয়রাত এবং ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে লোকজন তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকে। অধিকন্তু, তাঁকে বড় বড় আলেম এবং সম্মানিত ওলীদের দলভুক্ত ধরে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন।

এমন অবস্থার একপর্যায়ে তিনি শাম দেশ (বৃহত্তর সিরীয় অঞ্চল) ভ্রমণে যান এবং সেখানে গিয়ে মূর্তির পূজা-অর্চনার জাঁকালো চর্চা প্রত্যক্ষ করেন। শাম দেশ বহু নবী-রাসুলের জন্মভূমি এবং আল্লাহর বাণী নাজিলের ক্ষেত্র হওয়ায় ওই সকল মূর্তিপূজাকে তিনি অধিকতর ভালো এবং সত্য বলে ধারণা করেন। তাই দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি 'হুবাল' নামক মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং কা'বা গৃহের মধ্যে তা রেখে দিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসীদেরও পূজা করার জন্য আহ্বান জানান। মক্কাবাসীগণ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মূর্তি হুবালের পূজা করা শুরু করে দেয়। কাল-বিলম্ব না করে সমগ্র হিজাযবাসীও মক্কাবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকেন। কারণ, তাঁরাও এককালে বাইতুল্লাহর অভিভাবক এবং হারামের বাসিন্দা ছিলেন। এভাবে একত্ববাদী আরববাসী অবলীলাক্রমে মূর্তিপূজার মতো এক অতি জঘন্য এবং ঘৃণিত পাপাচার ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এভাবে আরব-ভূমিতে মূর্তিপূজার গোড়াপত্তন হয়ে যায়।[২১৯]

এ থেকে বোঝা গেল হুবাল মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলা মোটেও এক নয়। হুবাল পরবর্তীকালে মক্কায় আমদানি করা একটি কাল্পনিক দেবমূর্তি ছাড়া কিছুই নয়। মক্কায় ইবরাহিমী দ্বীনের মধ্যে শির্কের প্রচলন ঘটানোয় আমর বিন লুহাইর কী পরিণতি হয়?

নবী ﷺ বলেন,

رَأَيْتُ عُمَرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَى الْخُزَاعِى يَجُرُّ قَصَبَهُ [أَىْ أَمْعَاءَهُ] فِي النَّارِ

---

[২১৯] ■ *আর রাহিকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.) [তাওহীদ পাবলিকেশন্স] পৃষ্ঠা : ৫৫
■ শাইখ মুহা. আব্দুল নাজদী (রহ.), *মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (সা.)*, ১২ পৃষ্ঠা
■ আরও দেখুন, *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম (র.) [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ] ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা :

'আমি আমর বিন লুহাইকে জাহান্নামের মধ্যে তার নাড়ি-ভুঁড়ি টানতে দেখেছি।'

কেননা, 'আমর বিন লুহাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইবরাহিম (আ.)-এর দ্বীনে পরিবর্তন আনয়ন এবং মূর্তির নামে চতুষ্পদ জন্তু উৎসর্গ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।'[২২০]

ইসলামে যদি হুবালের উপাসনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবে সমাদৃত হতো, তাহলে নবী ﷺ কেন এর সূচনাকারীর জাহান্নামী হবার কথা বলবেন?

হাদিস ও সিরাতশাস্ত্রে এমনকি ইসলামের শত্রুদের উক্তি থেকেও আমরা দেখতে পাই যে, হুবাল এবং আল্লাহ মোটেও এক সত্তার নাম নয়; বরং মুসলিমদের সাথে তাদের শত্রুতাই তো এ কারণে ছিল যে, মুসলিমরা হুবালসহ সকল দেব-দেবীর উপাসনা ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করত। উহুদ যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে আমরা দেখি, যুদ্ধ শেষ হবার পর সে সময়ে মুসলিমদের সব থেকে বড় শত্রু আবু সুফিয়ান আল্লাহ তা'আলা ও হুবালকে আলাদা হিসাবে উল্লেখ করছে।

> "...অতঃপর সে [আবু সুফিয়ান] চিৎকার করে বলল, اعل هبل। অর্থাৎ "হুবাল সুউচ্চ হোক।"
>
> নবী ﷺ তখন সাহাবীদের বললেন, "তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন?" তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আমরা কী জবাব দেব? তিনি বললেন, "তোমরা বলো—الله اعلى و اجل। অর্থাৎ "আল্লাহ সব থেকে উচ্চ ও অতি সম্মানিত"।
>
> আবার আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলল, لنا العزى ولا عزى لكم অর্থাৎ "আমাদের উযযা আছে, তোমাদের উযযা নেই।" নবী ﷺ পুনরায় সাহাবীদের বললেন, "তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন?" তাঁরা বললেন, কী উত্তর দেব?
>
> তিনি বললেন, তোমরা বলো, الله مولانا ولا مولى لكم অর্থাৎ "আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, আর তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই।"[২২১]

ওপরের কথোপকথন দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, হুবাল এবং আল্লাহ মোটেও এক সত্তা না। মুসলিমরা শুধু আল্লাহর উপাসনা করত, হুবাল, উযযা এই সকল কাল্পনিক দেব-দেবীকে তারা পরিত্যাগ করেছিল।

হুবালের মূর্তিটি কা'বার ভেতরে ছিল। সেটি ছিল কা'বার ৩৬০ টি দেবমূর্তির একটি। মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ কা'বার সকল ছবি ও মূর্তি ধ্বংস করেন।

---

[২২০] *আর রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ৬০; *সহীহ বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯৯

[২২১] *আর রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ৩২০, *ইবন হিশাম*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৩-৯৪, *যাদুল মা'আদ*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৪ এবং *সহীহ বুখারী*, ২য় খণ্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ হুবালের মূর্তিটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[২২২] হুবাল যদি মুসলিমদের উপাস্য হতো, তাহলে কেন সেটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো?

ঠিক এই জিনিসটি উপলব্ধি করতে পেরে ড্যানিশ-আমেরিকান প্রাচ্যবিদ Patricia Crone বলেছেন,

> "If Hubal and Allah had been one and the same deity, Hubal ought to have survived as an epithet of Allah, which he did not."[২২৩]

অর্থাৎ হুবাল এবং আল্লাহ যদি একই উপাস্য হয়ে থাকত, তাহলে হুবাল আল্লাহর একটা গুণবাচক বিশেষণ হিসাবে টিকে থাকত, কিন্তু এমন কিছুই হয়নি।

এই পয়েন্টে ইসলামের শত্রুদের দাবির জবাব সংক্ষেপে যা বলা যেতে পারে :

১. হুবাল চন্দ্রদেবতা ছিল, এই কথা কেবল ইসলামবিরোধীদের উক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। এর স্বপক্ষে কোনো প্রকারের প্রমাণ প্রাথমিক উৎসগুলোতে (primary source) নেই। প্রাথমিক সূত্রগুলো অনুযায়ী হুবাল দেবতা ভাগ্য গণনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

২. যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, হুবাল ছিল চন্দ্রদেবতা তবুও তাকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করবার কোনো উপায় নেই। ইসলামের প্রাথমিক সূত্রগুলোর তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, হুবাল এবং আল্লাহ মোটেও এক নয়।

মেসোপটেমীয় চন্দ্রদেবতা এবং মক্কাবাসীর আল্লাহ : মিল নাকি অমিল?

খ্রিষ্টান মিশনারি রবার্ট মোরির *The Islamic Invasion : Confronting The World's Fastest Growing Religion* বইতে বলবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় সিন (Sin) নামে যে চন্দ্রদেবতার পূজা করত, সেই পূজা প্রাচীন আরবেও চলে এসেছিল। নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময়ে পৌত্তলিক আরবরা সেই চন্দ্রদেবতাকে আল্লাহ বলত এবং ইসলামে সেই আল্লাহর উপাসনাই চালু আছে।[২২৪]

---

[২২২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির (র.) [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ] ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫১৮-৫১৯

[২২৩] Patricia Crone, *Meccan Trade And The Rise Of Islam*, 1987, page 193-194

[২২৪] *The Islamic Invasion : Confronting The World's Fastest Growing Religion* by Robert Morey; Page 47-53 and 211-218

চিত্র : খ্রিষ্টান মিশনারি রবার্ট মোরির বইতে ব্যাবিলোনীয় চন্দ্রদেবতা Sin এর ছবি[২২৫]

প্রাচীনকালে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে (বর্তমান ইরাক) যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা চালু ছিল। সুমেরীয়রা নান্না (Nanna) নামে এক চন্দ্রদেবতার উপাসনা করত। পরবর্তী সময়ে ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতায় যে দেবতার নাম দেওয়া হয় সিন (Sin)। সুয়েন (Suen) নামেও এই দেবতা পরিচিত। এই চন্দ্রদেবতা ছিল আকাশের দেবতা এনলিল এবং ফসলের দেবী নিনলিল এর পুত্র। তার পবিত্র শহর ছিল উর (Ur)। চন্দ্রদেবতা সিনের স্ত্রীর নাম নিনগাল। তাদের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্র সূর্যদেবতা শামাশ (Shamash) এবং কন্যা শুক্রগ্রহের দেবী ইশতার (Ishtar)।[২২৬]

প্রাচীন আরবে কি আদৌ এমন কোনো পৌত্তলিক দেবতার উপাসনা হতো?

প্রথমত

ব্যাবিলনীয় যে চন্দ্রদেবতার যে ধারণা আমরা দেখলাম, এর সাথে প্রাচীন আরবের পৌত্তলিকদের আল্লাহর ধারণার কি মিল ছিল? প্রাচীন আরবরা আল্লাহকে মোটেও

---

[২২৫] *The Islamic Invasion : Confronting The World's Fastest Growing Religion* by Robert Morey; Page 47-53 and 212

[২২৬] ■ "Sin (mythology) - New World Encyclopedia"
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sin_(mythology)
■ "Shamash - New World Encyclopedia"
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shamash

'সিন' বলে ডাকত না। তা ছাড়া ব্যাবিলনীয় চন্দ্রদেবতা ছিল আকাশের দেবতা এনলিল এবং ফসলের দেবী নিনলিল এর সন্তান। অপরদিকে, আরব পৌত্তলিকরা আল্লাহ তা'আলাকে মোটেও কারও সন্তান মনে করত না। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা অন্য রকম ছিল। আল্লাহকে তারা সকল কিছুর আদি সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত।[২২৭] চন্দ্রদেবতা সিন এর ২টি সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। আর আল্লাহ সম্পর্কে আরবের পৌত্তলিকদের বিকৃত বিশ্বাস ছিল : আল্লাহর তিন কন্যা আছে, যারা হচ্ছে লাত, মানাত ও উযযা (নাউযুবিল্লাহ)।[২২৮] আর এদেরও তারা সূর্যদেবতা কিংবা শুক্রগ্রহের দেবী বলে মনে করত না। বিশ্বাসের এই বিশাল ভিন্নতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আরবের পৌত্তলিকদের আল্লাহর ধারণা ব্যাবিলনীয় চন্দ্রদেবতা সিন থেকে প্রভাবিত না।

দ্বিতীয়ত

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে সে অঞ্চলে যেসব দেব-দেবীর উপাসনা হতো, তার একদম বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে হিশাম ইবন কালবী (র.) এর *কিতাবুল আসনাম* গ্রন্থে।[২২৯] ৮ম শতাব্দীতে লিখিত এই বইতে সেই যুগে উপাসনা হওয়া দেব-দেবীর তালিকা আছে। কিন্তু পুরো বইতে কোনো চন্দ্রদেবতার উল্লেখ নেই। সিরাত ইবন হিশামেও সে সময়ে পূজিত দেব-দেবীর সবিশেষ উল্লেখ আছে।[২৩০] কিন্তু সেখানেও কোনো চন্দ্রদেবতার খোঁজ পাওয়া গেল না। ইসলামের কোনো প্রাথমিক উৎসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বসবাসের এলাকায় চন্দ্রদেবতার পূজার উল্লেখ নেই।

প্রাচীন আরব ছিল পৌত্তলিকতার লীলাভূমি। সেখানে বহু কাল্পনিক দেব-দেবীর উপাসনা হতো। আমি সে সময়কার মূর্তিপূজার ব্যাপারে অনুসন্ধান করে যা পেলাম—দক্ষিণ আরবের হাদরামাউতে (বর্তমান ইয়েমেনের একটি অঞ্চল) আকাশ,[২৩১] সূর্য,[২৩২]

---

[২২৭] এ বিষয়ে একটু পরেই "*আল্লাহ সম্পর্কে মক্কার পৌত্তলিক আরবদের বিশ্বাস : আল্লাহ কি আসলেই ৩৬০ দেবতার একজন ছিলেন?*" এই পয়েন্টের ভেতর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

[২২৮] *আল কুরআনে* তাদের এই বিকৃত বিশ্বাসের অপনোদন করে বলা হয়েছে : আল্লাহর কোনো সন্তান নেই; বরং এগুলো তো কিছু কাল্পনিক নামমাত্র। সুরা নাজম, ৫৩ : ১৯-২৩ দ্রষ্টব্য

[২২৯] এখান থেকে বইটি পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে : https://archive.org/details/KitabAlAsnam

[২৩০] *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৭-১১২

[২৩১] *The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons* by Manfred Lurker; Page 22

[২৩২] *The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons*' by Manfred Lurker; Page 165

চন্দ্র[২০৩] ইত্যাদির সাথে বিভিন্ন দেবতাকে সংশ্লিষ্ট করে পূজা করা হতো। সেই সাথে আরও অনেক দেবতার উপাসনা হতো। কিন্তু এই উপাসনা হতো ইয়েমেনে; মক্কায় না। কারও কারও মতে, ইয়েমেনের হাদরামাউতে যে চন্দ্রদেবতার পূজা হতো তার নাম 'সিন'।[২০৪] এখানে আরও কথা রয়েছে। কারও কারও মতে এই 'সিন' চন্দ্রদেবতা ছিল না; বরং সূর্যদেবতা ছিল![২০৫] ইয়েমেনের ওই দেবতাও যে চন্দ্রদেবতা ছিল সেটিও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। আর সেটি চন্দ্রদেবতা বা সূর্যদেবতা যা-ই হোক, সেই দেবতার নাম মোটেও 'আল্লাহ' ছিল না। সে সময়ে বিভিন্ন গোত্রের আলাদা আলাদা দেব-দেবী ছিল। মক্কায় "চন্দ্রদেবতা"-এর পূজা আদৌ হতো না। কাজেই "মক্কার চন্দ্রদেবতা থেকে আল্লাহর ধারণা নেওয়া হয়েছে"—এই অভিযোগ সত্য হবার দূরতম সম্ভাবনাও নেই।

খ্রিষ্টান মিশনারি রবার্ট মোরি তার *The Islamic Invasion : Confronting The World's Fastest Growing Religion* বইতে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে চন্দ্রমন্দির ছিল এবং সেগুলো চন্দ্রদেবতার পূজা হতো বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলো আসলেই চন্দ্রমন্দির কি না তা নিয়ে ব্যাপক সংশয়ের অবকাশ আছে। একটা উদাহরণ দিই। রবার্ট মোরি তার বইয়ের ২১৩-২১৪ পৃষ্ঠায় ১৯৫০ সালে ফিলিস্তিনের হাজর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন উপাসনালয়কে 'চন্দ্রমন্দির' বলে দাবি করেছেন। সেখানে প্রাপ্ত মূর্তিকে 'চন্দ্রদেবতা'-এর মূর্তি বলে দাবি করেছেন।
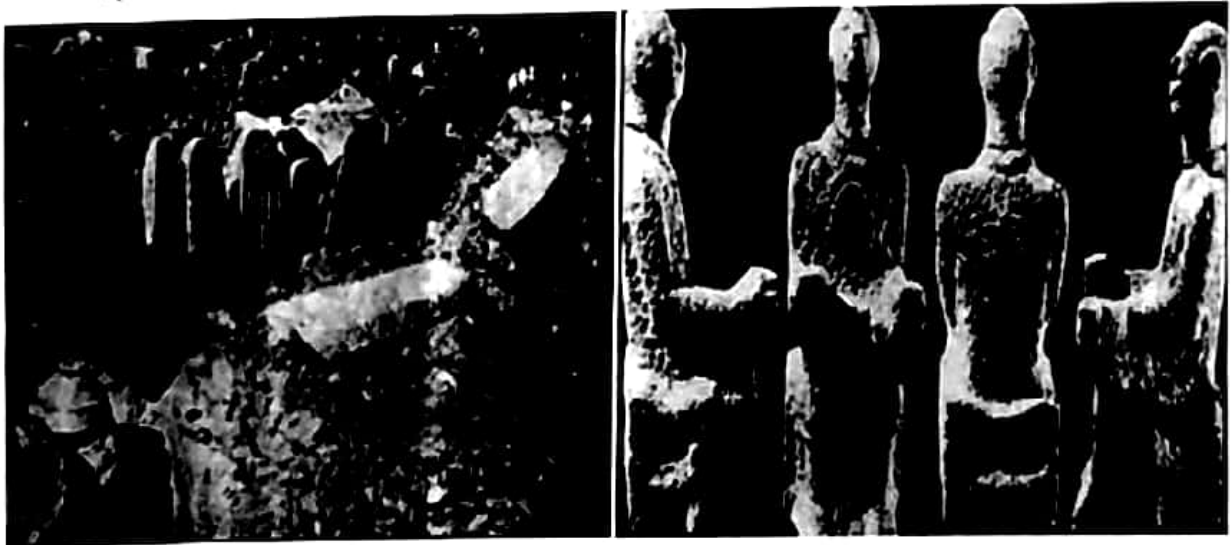
চিত্র : ফিলিস্তিনের হাজরে আবিষ্কৃত উপাসনালয় ও বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা

---

[২০৩] *The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons*' by Manfred Lurker; Page 173

[২০৪] *The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons*' by Manfred Lurker; Page 173

[২০৫] ■ Arabia Felix From The Time Of The Queen Of Sheba, Eighth Century B.C. To First Century A.D, J. F. Breton (Trans. Albert LaFarge), page 122

মূর্তির ছবি[২৩৬]

কিন্তু প্রাপ্ত মূর্তিগুলো আদৌ চন্দ্রদেবতার মূর্তি কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। মূর্তিটি হাতে একটি পেয়ালা ধরে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন ভঙ্গিমা কোনো উপাস্য মূর্তির হয় না; বরং উপাসকের হয়। এসব কারণে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এটি সেখানকার পুরোহিতের মূর্তি।[২৩৭]

যদি এটাও ধরে নিই যে ওটি আসলেই কোনো চন্দ্রদেবতার মূর্তি, তা থেকেও মোটেই এটা প্রমাণ হয় না যে মুসলিমদের আল্লাহর উপাসনা সেখান থেকে এসেছে। সে সময়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্যেই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা হতো। এর মাঝে যদি মক্কা থেকে সুদূর ফিলিস্তিনে একটা চন্দ্রদেবতার মূর্তি থেকেও থাকে, এ থেকে কীভাবে প্রমাণ হয় যে মুহাম্মাদ ﷺ সেখান থেকে আল্লাহর ধারণা নিয়েছেন?!! তিনি সে সময়ের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে দাওয়াত দিয়েছেন। এমনকি ফিলিস্তিনের সেই মূর্তিটির কোনো নামও কারও জানা নেই। ইসলামের একদম মূল দাওয়াহর একটা হচ্ছে : মূর্তিপূজা ধ্বংস করা।[২৩৮] যে মূর্তিপূজা ধ্বংস করা ইসলামের মূলমন্ত্রের একটি,

---

[২৩৬] *The Islamic Invasion : Confronting The World's Fastest Growing Religion* by Robert Morey; Page 214

[২৩৭] "The statue was found decapitated, and the head was discovered lying on a floor at a lower level. It depicts a man, possibly a priest, seated on a cubelike stool. He is beardless with a shaven head; his skirt ends below his knees in an accuentated hem; his feet are bare. He holds a cup in his right hand, while his left, clenched into a fist, rests on his left knee...."
From: *Treasures of The Holy Land: Ancient Art From The Israel Museum* (Metropolitan Museum of Art, NY:1986)' , Page 107

[২৩৮] মক্কা বিজয়ের পর রাসুল ﷺ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং হাতের মাথা বাঁকানো লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। এ সময় কা'বাগৃহের ভেতরে ও বাইরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ হাতের লাঠি দ্বারা এগুলো ভাঙতে থাকেন এবং কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে থাকেন। وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 'তুমি বলো, হক এসে গেছে, বাতিল দূরীভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল দূরীভূত হয়েই থাকে।' (বনি ইস্রাঈল, ১৭/৮১)। তিনি আরও পড়েন, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ 'তুমি বলো, হক এসে গেছে এবং বাতিল আর না শুরু হবে, না ফিরে আসবে' (সাবা, ৩৪/৪৯)। অর্থাৎ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা এমনভাবে পর্যুদস্ত হয় যে, তা কোনো বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না' (বুখারী, হা/৪২৮৭)।

ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী অতঃপর তিনি উসমান বিন ত্বালহাকে ডেকে তাকে ভেতর থেকে সমস্ত মূর্তি-প্রতিকৃতি বের করার নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি তার মধ্যে ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর দুটি প্রতিকৃতি দেখেন। যাদের হাতে ভাগ্য-নির্ধারণী তির দেখে তিনি বলে ওঠেন, قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ 'মুশরিকদের আল্লাহ ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! তারা জানে যে, তাঁরা কখনোই এ ধরনের ভাগ্য-তির ব্যবহার করেননি।' তিনি বলেন, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'ইবরাহিম কখনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।' (আলি ইমরান, ৩/৬৭)। ইবন আব্বাসের (রা.) অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সেখানে মারিয়মের ছবিও ছিল (বুখারী, হা/৩৩৫১)। এভাবে সমস্ত ছবি-মূর্তি দূর হওয়ার পর তিনি কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন ও ঘরের চারিদিকে তাকবীর দেন (বুখারী, হা/৪২৮৮)।
[*সীরাতুর রাসূল (ছা.)*, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৫৩৫]

সেটিকেই ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়া কি হাস্যকর প্রচেষ্টা নয়?

তর্কের খাতিরে তবুও যদি ধরে নিই যে পৌত্তলিক আরবরা চন্দ্রদেবতার পূজা করত এবং তাকে 'আল্লাহ' বলত, তবুও তা থেকে ইসলামকে পৌত্তলিক বলার সুযোগ ছিল না। কারণ, ইসলামে স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের পৌত্তলিক ধারণাগুলোর সাথে মোটেও একমত হয়নি; বরং কুরআনে স্রষ্টা সম্পর্কে যাবতীয় পৌত্তলিক ধারণাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, পৌত্তলিক স্রষ্টার উপাসনাকে অস্বীকার করা হয়েছে। পৌত্তলিকদের উদ্দেশে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এই কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝١

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢

অর্থ : বলো, হে কাফিরেরা, আমি আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা করো।[২৩৯]

প্রাচীন ইরাকের যে চন্দ্রদেবতার সাথে আল্লাহকে মেলানোর অপচেষ্টা করা হয়, সেই চন্দ্রদেবতা উপাসনার ব্যাপারে কি কুরআনে কিছু বলা আছে? আল্লাহর নবী ইবরাহিম (আ.) প্রাচীন ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানকার 'উর' শহরের বাসিন্দা ছিলেন, যা ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কুফা শহরের নিকটে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক ওই শহরটির ভূগর্ভ খননের সময় যে সকল শিলালিপি পুঁথি-পুস্তক ও দলিলাদি উদ্ধার করা হয়েছে তার মাধ্যমে এ শহর সম্পর্কে নানা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু, এসবের মাধ্যমে ইবরাহিম (আ.), তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশধরগণ এবং তথাকার বাসিন্দাগণের ধর্মীয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং অবস্থা সম্পর্কে বহু নতুন নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।[২৪০] একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, চন্দ্রদেবতা সিন এর পবিত্র শহর ছিল উর। চন্দ্রদেবতা সিনের পুত্র সূর্যদেবতা শামাশ এবং কন্যা শুক্রগ্রহের দেবী ইশতার (Ishtar)। প্রাচীন ইরাকের সেই জায়গাটি ছিল চন্দ্রসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার লীলাভূমি। তারা মূর্তিসহ এসব দেব-দেবীর পূজা করত। ইবরাহিম (আ.) যেহেতু সেই অঞ্চলেরই বাসিন্দা, তাঁর সাথে এসব দেব-দেবীর পূজারীদের দেখা হবার কথা।

আল কুরআনে নবী ইবরাহিম (আ.) এর জীবন ও ধর্মপ্রচারের বহু বিবরণ রয়েছে। তাঁর সময়ে শুকতারা বা শুক্রগ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য এগুলোর সাথে কাল্পনিক দেবতাদের

---

[২৩৯] *আল কুরআন*, কাফিরুন, ১০৯ : ১-২

[২৪০] *আর রাহিকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.) [তাওহীদ পাবলিকেশন্স] পৃষ্ঠা : ৩৭

সংশ্লিষ্ট করে উপাসনার বস্তু বানানো হতো। মূর্তিসহকারে পূজা করা হতো। এই ব্যাপারগুলো আল কুরআনের পাতাতেও উঠে এসেছে। কেউ যদি সে পাতাগুলো খুলে দেখে, প্রাচীন ইরাকের অদেখা জগৎ আল কুরআনের বর্ণনায় চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠে আসবে। সে দেখতে পাবে, আল্লাহর এক প্রিয় বান্দার সাথে পৌত্তলিকদের দ্বন্দ্বের চিত্র। সে জানবে, আল্লাহর নবী ইবরাহিম (আ.) গ্রহ, চাঁদ, সূর্য সবকিছুর উপাসনা অস্বীকার করেছেন এবং এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে নিজ সম্প্রদায়কে আহ্বান করেছেন।

> "এমনিভাবেই আমি ইবরাহিমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। **যখন রাতের অন্ধকার তাকে আবৃত করল তখন সে আকাশের একটি গ্রহ**[২৪১] **দেখতে পেল,** আর বলল : এটা তো আমার প্রভু! কিন্তু যখন ওটা অস্তমিত হলো তখন সে বলল : **আমি অস্তমিত বস্তুকে ভালোবাসি না।**
>
> অতঃপর যখন সে **চাঁদ উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল,** বলল, এ তো আমার প্রভু! পরে যখন তা ডুবে গেল, বলল, যদি আমার প্রভু আমাকে সুপথ না দেখান, নিশ্চয়ই আমি পথহারা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।
>
> অতঃপর যখন **সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল,** বলল, এ তো আমার প্রভু, এ সবচেয়ে বড়! পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, **হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক করো, আমি ওসব থেকে মুক্ত। নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিক (অংশীবাদী)-দের অন্তর্ভুক্ত নই।**
>
> আর তাঁর জাতি তাঁর সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, **তোমরা কি বাদানুবাদ করছ আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে, অথচ তিনি আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন? তোমরা তাঁর সাথে যা শরীক করো, আমি তাকে ভয় করি না, তবে আমার প্রভু যদি কিছু করতে চান (তাহলে ভিন্ন কথা)। আমার প্রভু ইলম দ্বারা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন।** অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না'? **তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদের আমি কীভাবে ভয় করতে**

---

[২৪১] ■ 'كوكب' শব্দের সঠিক অনুবাদ 'গ্রহ'।
"...and using the word "kawkab" to refer to solid heavenly bodies that are not burning, such as the planets of the solar system, ..."
From: "Meteorites and shooting stars may be called "stars" (nujoom) and "heavenly bodies" (kawaakib) in Arabic"- islamQA (Shaykh Muhammmad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/243871/
■ "Translation and Meaning of كوكب In English, English Arabic Dictionary" (almaany)
https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/كوكب/

পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছ না যে, আল্লাহর সাথে যাদের তোমরা শরীক করছ, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোনো দলিল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে, তাহলে বলো তো? প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুলমের সাথে (শির্কের সাথে) মিশ্রিত করেনি।

আর এ হচ্ছে আমার দলিল, আমি ইবরাহিমকে তার জাতির ওপর দান করেছি। আমি যাকে চাই, তাকে মর্যাদায় উঁচু করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"[২৪২]

নবী ইবরাহিম (আ.) শুধু এগুলোর উপাসনাকে অস্বীকারই করেননি; বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনাকে শয়তানের উপাসনা হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

"বর্ণনা করো এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহিমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত করো, যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোনো উপকারে আসতে পারে'? 'হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করো, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব।'

'হে আমার পিতা, **তুমি শয়তানের ইবাদাত কোরো না।** নিশ্চয়ই শয়তান হলো পরম করুণাময় [আল্লাহ]-এর অবাধ্য'।"[২৪৩]

এসব দেব-দেবীর উপাসনাকে নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি, এসবের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন ইবরাহিম (আ.)। তাদের এটাও বুঝিয়ে বলেছেন যে, উপাসনা করা উচিত একমাত্র তাঁরই, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। কাল্পনিক দেব-দেবীর নিজ হাতে তৈরি মূর্তির উপাসনা করা কোনো যৌক্তিক কাজ নয়।

"তারা বলল, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।' সে বলল, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'। তারা বলল : তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, নাকি তুমি কৌতুক করছ? সে বলল, 'না; বরং তোমাদের প্রভু তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু; যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী'। শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে

---

[২৪২] *আল কুরআন*, আন'আম, ৬ : ৭৫-৮৩

[২৪৩] *আল কুরআন*, মারইয়াম, ১৯ : ৪১-৪৪

অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব। **অতঃপর সে মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তাদের বড় (প্রধান)-টি ছাড়া, যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে।"**[২৪৪]

"তখন লোকেরা তার দিকে ছুটে এল। সে বলল : **তোমরা নিজেরা যাদের খোদাই করে নির্মাণ করো, তাদেরই কি পূজা করো? 'অথচ আল্লাহই তোমাদের এবং তোমরা যা করো তা সৃষ্টি করেছেন'**[২৪৫]

আল কুরআনে ইবরাহিম (আ.) এর কার্যাবলির প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁকে "আল্লাহর বন্ধু" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর ধর্মাদর্শের দিকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং একনিষ্ঠ ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে, তার চাইতে উত্তম দ্বীন কার? আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"[২৪৬]

প্রাচীন ইরাকে মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তু নিয়ে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, আল কুরআন এর মূলে কুঠারাঘাত করে রেখেছে। যে চন্দ্রদেবতা এবং পৌত্তলিকতার সাথে ইসলামকে জড়ানোর অপচেষ্টা আজ করা হচ্ছে, আল কুরআনে তার মূল উৎসকেই খণ্ডন করে দেওয়া আছে, ইবরাহিম (আ.) এর ঘটনায়। সুবহানাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাবে সকল কিছুর যথাযথ বিবরণ আছে।

"...আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।"[২৪৭]

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচারকারী খ্রিষ্টীয় প্রচারকরা হুবাল, সিন প্রভৃতি পৌত্তলিক দেবতাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়ে এক বিকৃত মিথ্যা অপবাদ ইসলামের ওপর আরোপ করেছে। কিন্তু প্রকৃত বিশেষজ্ঞরা ইসলামের নামের এমন উদ্ভট জিনিস বলেন না। *International Journal of Frontier Missions* এর "Who Is "Allah"?" শীর্ষক আর্টিকেলে প্রখ্যাত বাইবেল পণ্ডিত Rick Brown উল্লেখ করেছেন :

"...Those who claim that Allah is a pagan deity, most notably the moon god, often base their claims on the fact that a symbol of the crescent moon adorns the tops of many mosques and is widely used as a symbol of Islam. It is

---

[২৪৪] *আল কুরআন*, আম্বিয়া, ২১ : ৫৩-৫৯

[২৪৫] *আল কুরআন*, আস সফফাত, ৩৭ : ৯৪-৯৬

[২৪৬] *আল কুরআন*, নিসা, ৪ : ১২৫

[২৪৭] *আল কুরআন*, নাহল, ১৬ : ৮৯

in fact true that before the coming of Islam many 'gods' and idols were worshipped in the Middle East, **but the name of the moon god was Sin, not Allah, and he was not particularly popular in Arabia, the birthplace of Islam. The most prominent idol in Mecca was a god called Hubal, and there is no proof that he was a moon god.** It is sometimes claimed that there is a temple to the moon god at Hazor in Palestine. This is based on a representation there of a supplicant wearing a crescent-like pendant. It is not clear, however, that the pendant symbolizes a moon god, and in any case this is not an Arab religious site but an ancient Canaanite site, which was destroyed by Joshua in about 1250 BC. ... If the ancient Arabs worshipped hundreds of idols, then no doubt the moon god Sîn was included, for even the Hebrews were prone to worship the sun and the moon and the stars, **but there is no clear evidence that moon-worship was prominent among the Arabs in any way or that the crescent was used as the symbol of a moon god, and Allah was certainly not the moon god's name...**"[২৪৮]

অর্থাৎ যারা দাবি করে আল্লাহ একজন পৌত্তলিক দেবতা, নির্দিষ্ট করে বললে চন্দ্রদেবতা, তাদের দাবির ভিত্তি হচ্ছে একফালি চাঁদের চিহ্ন, যা অনেক মসজিদের ওপরিভাগে দেখা যায় এবং যেটিকে ইসলামের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটা সত্য যে ইসলামপূর্ব যুগে মধ্যপ্রাচ্যে বহু দেবতা ও মূর্তির পূজা করা হতো, **কিন্তু চন্দ্রদেবতার নাম ছিল 'সিন', আল্লাহ নয়। এবং এই দেবতা ইসলামের জন্মভূমি আরবে সেভাবে জনপ্রিয় ছিল না। মক্কার সব থেকে প্রসিদ্ধ মূর্তিটি ছিল হুবাল দেবতার এবং এটি চন্দ্রদেবতা বলে কোনো প্রমাণ নেই।** কখনো কখনো এই দাবিও করা হয় যে, ফিলিস্তিনের হাজরে চন্দ্রদেবতার একটি মন্দির ছিল। অর্ধচন্দ্র আকৃতির গলার হার পরা একজন পূজারির মূর্তি দেখিয়ে এই কথা বলা হয়। সেই গলার হারটি যে চন্দ্রদেবতাকেই নির্দেশ করে এটা মোটেও স্পষ্ট নয়। আর এটা কোনোভাবেই প্রাচীন আরবদের ধর্মীয় স্থান ছিল না; বরং কানানীয় (Canaanite)দের ধর্মীয় স্থান ছিল। যেটিকে ১২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ধ্বংস করেন যিহোশূয় (ইউশা বিন নুন)। ... যদি

---

[২৪৮] R. Brown, "Who Is "Allah"?", *International Journal of Frontier Missions*, 2006, Volume 23, No. 2, page 79-80.
এখান থেকে : https://bit.ly/2z6dEde অথবা এখান থেকে https://bit.ly/2PmNQDL পূর্ণ আর্টিকেলটি পড়া যাবে।

প্রাচীন আরবরা শত শত মূর্তির পূজা করে থাকে, তাহলে সন্দেহ নেই যে এর মাঝে চন্দ্রদেবতা সিনও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কারণ, এমনকি ইহুদিরাও একসময়ে সূর্য, চন্দ্র এবং তারকার পূজা করেছিল। **কিন্তু চন্দ্রপূজা আরবদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। কিংবা একফালি চাঁদকে চন্দ্রদেবতার প্রতীক হিসাব ব্যবহার করা হতো এমনও কোনো প্রমাণ নেই। এবং কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ কোনো চন্দ্রদেবতার নাম ছিল না।**

আল্লাহ্ সম্পর্কে মক্কার পৌত্তলিক আরবদের বিশ্বাস : আল্লাহ্ কি আসলেই ৩৬০ দেবতার একজন ছিলেন?

অনলাইন জগতে এই কথাটা প্রায়ই শোনা যায়। মুসলিমদের দিকে চট করে অভিযোগের আঙুল তুলে বলা হয়—"তোমরা তো আল্লাহর উপাসনা করো। কিন্তু তোমরা কি জানো যে মক্কার পৌত্তলিকরাও আল্লাহর উপাসনা করত? কা'বায় ৩৬০টা দেবতার মূর্তি ছিল। আর এর একজন দেবতা ছিল আল্লাহ! তাহলে তোমাদের সাথে তাদের পার্থক্য রইল কী?"

কথাগুলোর ভেতরে কিছু সত্য আছে। আবার সূক্ষ্ম মিথ্যাও আছে।

আরবের মক্কায় বসবাসকারী সাধারণ লোকজন সেই প্রাচীনকাল থেকেই ইসমাঈল (আ.)-এর দাওয়াত ও প্রচারের ফলে ইবরাহিম (আ.) প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই তাঁরা ছিলেন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করতেন। কিন্তু কালপ্রবাহে ক্রমান্বয়ে তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদ এবং খালেস দ্বীনী শিক্ষার কোনো কোনো অংশ ভুলে যেতে থাকেন, কিংবা সে সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন।[২৪৯] কীভাবে মক্কায় মূর্তিপূজা আরম্ভ হয় সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই **"হুবাল এবং আল্লাহ কি এক?"** এই পয়েন্টে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। আমর বিন লুহাই নামে মক্কার এক নেতা শাম (বৃহত্তর সিরীয় অঞ্চল) থেকে মূর্তিপূজার আমদানি ঘটায়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আল্লাহর একত্ববাদ এবং দ্বীনে ইবরাহিম (আ.) এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থেকে যায়। আর কিছু কিছু বিকৃত জিনিস এর সাথে মিশ্রিত হয়। খাঁটি ইবরাহিমী একত্ববাদী থেকে তারা মুশরিক বা অংশীবাদী পৌত্তলিকে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে শুরু হয় অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর অন্যায়ের এক যুগ, ইতিহাসে যাকে বলা হয় 'আইয়ামে জাহেলিয়াত'।

আল কুরআনে, হাদিসে এবং সিরাহ-গ্রন্থগুলোতে অন্যান্য জিনিসের সাথে সাথে আরব পৌত্তলিকদের অনেক বিশ্বাসের কথাই উঠে এসেছে। আল কুরআনে বিভিন্ন

---

[২৪৯] *আর রাহিকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.) [তাওহীদ পাবলিকেশন্স] পৃষ্ঠা : ৫৫

স্থানে সে যুগের আরব মুশরিক বা পৌত্তলিকদের বিশ্বাস উল্লেখ করে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে।

মক্কার আরবরা নিজেদের ইবরাহিম (আ.) এর বংশধর হিসাবে বিশ্বাস করত,[২৫০] এবং ইবরাহিম (আ.) এর উপাস্য আল্লাহ তা'আলাকে তারাও উপাসনা করত। যদিও এর সাথে সাথে তারা মূর্তিপূজাও করত। আল্লাহকে আরব মুশরিকরাও তাদের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করত। সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বলেও বিশ্বাস করত।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

> অর্থ : **তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে : "আল্লাহ"**। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?[২৫১]

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

> অর্থ : আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, **আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে : "আল্লাহ"**। তুমি বলো : আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহম করতে চাইলে, তারা কি সে রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তাঁরই ওপর ভরসা করে।[২৫২]

তারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর বিশ্বাসের সাথে সাথে বিভিন্ন নব-উদ্ভাবিত উদ্ভট ধারণার প্রচলন করেছিল। তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করতে শুরু করে। তারা লাত, মানাত এবং উযযা নামে তিন কাল্পনিক দেবীকে আল্লাহর কন্যা বলা শুরু করে (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ এমন কোনো কিছুর ব্যাপারে তাদের কোনো দলিল-প্রমাণ ছিল না, ইবরাহিম (আ.) বা পূর্বের কোনো নবী এরূপ কিছু শিক্ষা দেননি। *আল কুরআনে* তাদের এই নব-উদ্ভাবিত বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরপর এই ভ্রান্ত বিশ্বাস নাকচ করে পৌত্তলিকতার নোংরামি ঝেড়ে ফেলে

---

[২৫০] *আর রাহিকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র.) [তাওহীদ পাবলিকেশন্স] পৃষ্ঠা : ৬২

[২৫১] *আল কুরআন*, যুখরুফ, ৪৩ : ৮৭

[২৫২] *আল কুরআন*, যুমার, ৩৯ : ৩৮

বিশুদ্ধ একত্ববাদিতার আহ্বান জানানো হয়েছে।

﴿١٩﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ

﴿٢٠﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ

﴿٢١﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ

﴿٢٢﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ

﴿٢٣﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ

অর্থ : তোমরা কি ভেবে দেখেছ **লাত ও উযযা** সম্বন্ধে? আর **মানাত** সম্পর্কে, যা তৃতীয় আরেকটি?

তোমাদের জন্য কি পুত্র আর আল্লাহর জন্য কন্যা? এ ধরনের বণ্টন তো অসংগত।

এগুলো তো কেবল কিছু নাম, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলিল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হিদায়াত এসেছে।[২৫৩]

﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ

﴿٢﴾ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

﴿٣﴾ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا

﴿٤﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

﴿٥﴾ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিজের বান্দার [মুহাম্মাদের (ﷺ)] প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি। একে সুপ্রতিষ্ঠিত

---

[২৫৩] *আল কুরআন*, নাজম, ৫৩ : ১৯-২৩

করেছেন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদের, যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। এবং তাদের **সতর্ক করার জন্যে যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। এ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। কত উদ্ভট তাদের মুখের কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা।**[২৫৪]

৮৮ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا

৮৯ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا

৯০ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

৯১ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا

৯২ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا

৯৩ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا

৯৪ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

৯৫ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

অর্থ : তারা বলে : **দয়াময় [আল্লাহ] সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময়ের জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।** নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় [আল্লাহ]-এর কাছে বান্দা হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদের গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।[২৫৫]

কী ভেবে তারা মূর্তিপূজা করত? এর স্বপক্ষে তাদের যুক্তি কী ছিল? আল কুরআন থেকেই এ বিষয়ে আমরা জানতে পারি। কুরআনে তাদের এই যুক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং খণ্ডন করা হয়েছে।

---

[২৫৪] *আল কুরআন*, কাহফ, ১৮ : ১-৫

[২৫৫] *আল কুরআন*, মারইয়াম, ১৯ : ৮৮-৯৫

﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

﴿٢﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

﴿٣﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

﴿٤﴾ لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

﴿٥﴾ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

অর্থ : “এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমি তোমার [মুহাম্মাদ ﷺ] প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, তুমি আল্লাহর ইবাদত করো তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে। জেনে রেখো, অবিমিশ্রিত আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।

যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও সত্য গোপনকারী।

আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ, এক পরাক্রমশালী। তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[২৫৬]

তারা আল্লাহকেই সকল কিছুর নিয়ন্তা বলে মানত। দেবতাদের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল যে, তারা তাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করবে বা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। তারা ওই দেবমূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে এক করে দেখত না।

---

[২৫৬] *আল কুরআন*, যুমার, ৩৯ : ১-৫

আল্লাহকে বিশ্বাসের সাথে সাথে শির্ক করা সেই জাতি ইবরাহিমী বিশ্বাসের ছিটেফোঁটা হিসাবে এটাও বলত যে, "আল্লাহর শরীক" নেই। কিন্তু এই কথা বলার পরে তারা উদ্ভট অপব্যাখ্যা করে আল্লাহর উপাসনায় শরীক করত। ইবরাহিম (আ.) এর শরিয়ত থেকে তারা হজের বিধান পেয়েছিল। সেই হজ তারা বংশপরম্পরায় ঠিকই চালু রেখেছিল, কিন্তু এর ভেতরে বিভিন্ন নব-উদ্ভাবন (বিদআত) এবং অংশীবাদ (শির্ক) ঢুকিয়ে ফেলেছিল।

তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ করত, তাওয়াফ করত, তার সামনে নত হতো ও সিজদা করত। তাওয়াফের সময় তারা শির্কী তালবিয়া পাঠ করত— لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

অর্থাৎ, '(হে আল্লাহ,) আমি হাজির। আপনার কোনো শরীক নেই—সেই শরীক ছাড়া, আপনি যার মালিক আর সে মালিক নয়।" মুশরিকরা 'লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা' [আমি হাজির, আপনার কোনো শরীক নেই] বলার পর রাসুল ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে "ক্বাদ, ক্বাদ" (থামো থামো) বলতেন।[২৫৭]

মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে আবার খাঁটি একত্ববাদী হজের তালবিয়া চালু করেন। আগের তালবিয়ার ভুল জিনিসগুলো বাদ দেন, সঠিক জিনিসগুলো বহাল রাখেন।

ইসলামী তালবিয়াহ হলো,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

> অর্থাৎ, "আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির। আমি হাজির, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই আপনার; আপনার কোনো শরীক নেই'[২৫৮]

আমরা দেখলাম যে, অংশী স্থাপন করলেও মক্কার মুশরিকরা তাদের অন্য দেবতাদের আল্লাহর সমতুল্য মনে করত না। আল্লাহর মর্যাদা তাদের নিকট সব থেকে উচ্চ ছিল। প্রাচীন আরবীয় সেই পৌত্তলিকদের নিকট আল্লাহ মহান স্রষ্টা হিসাবে বিবেচিত হতেন। এবং এই স্রষ্টা মোটেও তাদের দৃষ্টিতে কোনো পার্থিব দেবতা ছিলেন না। তাদের নিকট দেবতারা ছিল পার্থিব এবং আল্লাহ তা'আলা এর ঊর্ধ্বে। Oxford Islamic Studies এর ওয়েবসাইটেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে

---

[২৫৭] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ১১৮৫; *মিশকাত*, হাদিস নং : ২৫৫৪

[২৫৮] *সহীহ বুখারী*, হাদিস নং : ৫৯১৫; *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ২৮৬৮

যে, আরবের পৌত্তলিকরা কখনো আল্লাহর মূর্তি বানায়নি।[২৫৯] কাজেই আল্লাহ যে আরব মুশরিকদের ৩৬০ দেবতার একজন দেবতা ছিলেন কিংবা মূর্তিসহকারে পূজিত হতেন, ইসলামের শত্রুদের এ-জাতীয় কথা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

জাহিলিয়াতের যুগে আরবের পৌত্তলিকদের এই ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে নিচের ঘটনাটি থেকে।

> হুসাইন নামে এক বৃদ্ধ বেদুইন একবার রাসুলুল্লাহর ﷺ কাছে এল। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কয়জনের ইবাদাত করো, হুসাইন?"
>
> সে বলল, "সাত জনের। ছয় জন পৃথিবীতে আর একজন আসমানের ওপর।"[২৬০]
>
> নবী ﷺ তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কাকে ভয় করো?" সে বলল, "যিনি আসমানের ওপর আছেন তাঁকে।"
>
> তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "হুসাইন, কার কাছে চাও তুমি?" সে বলল, "যিনি আসমানের ওপর আছেন, তাঁর কাছে।"
>
> নবী ﷺ তখন বললেন, "তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তাদের বর্জন করে যিনি আসমানের ওপর আছেন [আল্লাহ] কেবল তাঁর ইবাদাত করো।"
>
> [রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা শুনে] হুসাইন ইসলাম গ্রহণ করলেন।[২৬১]

এই পৌত্তলিক আরব আল্লাহতেও বিশ্বাস করছিল, আবার বিভিন্ন পৃথিবীর কাল্পনিক দেব-দেবীতেও বিশ্বাস করছিল।

আল্লাহতে বিশ্বাসের সাথে সাথে তারা অংশী স্থাপন করত। যে কথা উঠে এসেছে

---

[২৫৯] "Allah - Oxford Islamic Studies Online"
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e128

[২৬০] সূরা মুলক, ৬৭ : ১৬-তেও আল্লাহর ক্ষেত্রে فِي السَّمَاءِ এই শব্দগুলো রয়েছে। হাফিজ ইবন আব্দুল বার (র.) এর মতে, فِي السَّمَاءِ এর অর্থ "আসমানের উপরে"। অর্থাৎ আরশেরও উপরে [কেননা, আরশ আসমানের উপরে; দেখুন *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির (র.), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৪-৫৫)]। যেমনটি আছে সূরা তাওবা, ৯ : ২-তে। "সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করো চার মাস..." এখানে فِي الأَرْضِ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরভাগ বোঝায়নি; বরং পৃথিবীর উপরে বিচরণকে বুঝিয়েছে। আত তামহিদ, ৭/১৩০ দ্রষ্টব্য। কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

فِي السَّمَاءِ এর আরও একটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো 'উপরে'। কেননা, আরবি ভাষায় 'سماء' দ্বারা 'উপর'ও বোঝায়। বিস্তারিত দেখুন : "What is meant by saying "Allah is in heaven" - islamqa (Shaykh Muhammad Saalih al Munajjid)"
https://islamqa.info/en/131956/

[২৬১] ▪ لأنك الله رحلة إلى السماء السابعة (*লি আন্নাকাল্লাহ, রিহলাহ ইলাস সামাইস সাবিআহ*) - আলি বিন জাবির আল ফাইফী, পৃষ্ঠা : ১৬
▪ আরও দেখুন, *তিরমিযী*, ৩৮২০-১২/৪৫২

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

অর্থ : তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।[২৬২]

নবী মুহাম্মাদ ﷺ মুশরিক আরবদের এসব নব-উদ্ভাবিত অংশীবাদী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলেন এবং আল্লাহর ওহীর দ্বারা বিশুদ্ধ ইবরাহিমী একত্ববাদের দাওয়াত দেন। আল কুরআনে পৌত্তলিক সেসব দেব-দেবীকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে। কেবল এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনার দিকে আহ্বান করা হয়েছে। সেই বিশুদ্ধ ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে যে ধর্ম একসময়ে প্রচার করেছিলেন তাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহিম (আ.)।

> "আর যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরাহিমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? আর অবশ্যই আমি তাকে দুনিয়াতে বেছে নিয়েছি এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
>
> যখন তাঁর প্রভু তাকে বললেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো।' সে বলল, 'আমি সকল সৃষ্টির প্রভুর কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম।' আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরাহিম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও (যে,) 'হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না। যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হলো তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদের বলেছিল, আমার পরে তোমরা কোন জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল, আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য—সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব।"[২৬৩]
>
> "ইবরাহিম ইহুদি ছিল না এবং খ্রিষ্টানও ছিল না; বরং সে হানিফ (একনিষ্ঠ) মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইবরাহিমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী [মুহাম্মাদ ﷺ] ও মুমিনগণ। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।"[২৬৪]
>
> "এবং আল্লাহ বলেছেন : তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ কোরো না, উপাস্য তো

[২৬২] *আল কুরআন*, ইউসুফ, ১২ : ১০৬

[২৬৩] *আল কুরআন*, বাকারাহ, ২ : ১৩০-১৩৩

[২৬৪] *আল কুরআন*, আলি ইমরান, ৩ : ৬৭-৬৮

মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় করো।"[২৬৫]

"সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা।"[২৬৬]

"তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোনো সনদ নাজিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[২৬৭]

"এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোনো বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে জানে না।"[২৬৮]

"তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্র হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়ে শক্তিহীন।"[২৬৯]

"অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।"[২৭০]

"বলো, তোমরা তাদের আহ্বান করো, আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাস্য মনে করতে, তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু-পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়।"[২৭১]

"বলো, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদের আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা ডাকো? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে, না আমি তাদের কোনো কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলিলের ওপর কায়েম রয়েছে; বরং জালেমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে।"[২৭২]

---

[২৬৫] *আল কুরআন*, নাহল, ১৬ : ৫১

[২৬৬] *আল কুরআন*, হাজ্জ, ২২ : ১২

[২৬৭] *আল কুরআন*, হাজ্জ, ২২ : ৭১

[২৬৮] *আল কুরআন*, নাহল, ১৬ : ২০-২১

[২৬৯] *আল কুরআন*, হাজ্জ, ২২ : ৭৩

[২৭০] *আল কুরআন*, নামল, ২৭ : ৬৩

[২৭১] *আল কুরআন*, সাবা, ৩৪ : ২২

[২৭২] *আল কুরআন*, ফাতির, ৩৫ : ৪০

“...এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।”[২৭৩]

“তারা তাঁর [আল্লাহর] পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।”[২৭৪]

“যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ যেন মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত।”[২৭৫]

“আর তোমরা তাঁকে (আল্লাহ) বাদ দিয়ে যাদের ডাকো তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।”[২৭৬]

“তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে।”[২৭৭]

“তাদের বলা হবে : তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? অতঃপর তাদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। এবং ইবলিসের বাহিনীর সকলকে।”[২৭৮]

“এবং সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে, যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেননি। **এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও,** যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা স্বাক্ষী হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সলাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন করো; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম

---

[২৭৩] *আল কুরআন*, হাজ্জ, ২২ : ৩১

[২৭৪] *আল কুরআন*, ফুরকান, ২৫ : ৩

[২৭৫] *আল কুরআন*, আনকাবুত, ২৯ : ৪১

[২৭৬] *আল কুরআন*, আ'রাফ, ৭ : ১৯৭

[২৭৭] *আল কুরআন*, আম্বিয়া, ২১ : ৯৮

[২৭৮] *আল কুরআন*, শু'আরা, ২৬ : ৯২-৯৫

সকালে ও সন্ধ্যায় যে সকল দুয়া-যিকিরের দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে :

أَصْبَحْنا / أَمْسَـينا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ،

> অর্থ : "আমরা সকালে/সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতরাতের ওপর, নিষ্ঠাপূর্ণ বাণী (তাওহিদ) এর ওপর, **আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের ওপর, আর আমাদের পিতা ইবরাহিম (আ.) এর ধর্মাদর্শের ওপর—যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।**"[২৮০]

এভাবে মুসলিমরা প্রতিদিন একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, নিজেদের ইবরাহিম (আ.) এর সাথে সংশ্লিষ্ট করছে এবং পৌত্তলিকতা বর্জনের ঘোষণা দিচ্ছে। যারা ইসলামকে পৌত্তলিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বানাতে চান, তারা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস ইসলামের ওপর আরোপ করেন। ইসলাম মোটেও পৌত্তলিক (pagan) নয়, ইসলাম সম্পূর্ণরূপে ইবরাহিমী (Abrahamic)। ইবরাহিম (আ.) এবং আল্লাহর সকল নবী তো একই ধর্ম প্রচার করেছেন আর তা হলো ইসলাম।

ধরা যাক একজন ব্যক্তি বৃষ্টির বিশুদ্ধ পানি একটি পাত্রে সংরক্ষণ করল। কিছুদিন পর সেই পানিতে ময়লা মিশ্রিত হয়ে দূষিত হয়ে গেল।

এরপর আরেকজন ব্যক্তি সেই পানিকে ফিল্টার করে এবং ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করে আবার আগের জায়গায় নিয়ে এল। এখন কেউ যদি বলে : ওই পানি খাওয়া যাবে না; কারণ, ওই পানি একসময় ময়লা ছিল। ওই পানি সম্পূর্ণ ফেলে দিতে হবে!—তাহলে সেটি কি যৌক্তিক কথা হবে? মোটেও না। কারণ, ওই পানি একসময় ময়লা থাকলেও পরে সেটিকে ফিল্টার করে এবং ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঠিক যেমন ওই পানি আদি অবস্থায় ছিল। পানিকে সম্পূর্ণ ফেলে না দিয়ে সেটিকে বিশুদ্ধ করাই যথেষ্ট।

একই ভাবে, প্রাচীন আরবের পৌত্তলিকদের ইতিহাস বলে ইসলামের ভিত্তিকে পৌত্তলিক বলাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা, আরব পৌত্তলিকদের ইতিহাসই মক্কার

---

[২৭৯] *আল কুরআন, হাজ্জ*, ২২ : ৭৮

[২৮০] *হিসনুল মুসলিম; মুসনাদ আহমাদ*, ৩/৪০৬, ৪০৭, নং ১৫৩৬০ ও নং ১৫৫৬৩; **ইবনুস সুন্নী**, *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ*, নং ৩৪। আরও দেখুন, **সহীহুল জামে'**, ৪/২০৯

সর্বপ্রাচীন ইতিহাস না। তারা সব সময় পৌত্তলিক ছিল না। তারা আল্লাহর ধারণা ও একত্ববাদী ধর্ম পেয়েছিল ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর কাছ থেকে। কালক্রমে তাদের মাঝে পৌত্তলিকতা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাদের মাঝে আগমন করেন, তাদের মধ্যকার সব পৌত্তলিকতাকে দূর করে দিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী একত্ববাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম আরব পৌত্তলিকদের আল্লাহতে বিশ্বাস বাতিল করে দেয়নি; কেননা, সেটা তো সঠিক বিশ্বাস। শুধু আল্লাহর সাথে তারা যে শরীক করত, সেগুলোকে বাতিল করেছে। আল্লাহ সম্পর্কে নব-উদ্ভাবিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো বাতিল করেছে। আরবের ইহুদিরা উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলত,[২৮১] ইসলাম তাদের এই জিনিসটিকে বাতিল করেছে। তাদের আল্লাহ ও নবী-রাসুলে বিশ্বাসকে বাতিল করে দেয়নি। খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করত, ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলত। আল কুরআনে খ্রিষ্টানদের এই জিনিসগুলো বাতিল বলে অভিহিত করা হয়েছে। খ্রিষ্টানদের আল্লাহতে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস—এর সবকিছুকে বাতিল করে দেওয়া হয়নি।

এবার এতক্ষণের আলোচনা থেকে ঝটপট কিছু পয়েন্ট করে ফেলা যাক :

১. মক্কার মানুষেরা ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) এর মাধ্যমে একত্ববাদী ধর্মাদর্শ পেয়েছিল। তারা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করত। কালক্রমে তাদের সত্যধর্মে বিভিন্ন নব-উদ্ভাবন চালু হয়ে যায়। তাদের মাঝে মূর্তিপূজা শুরু হয় এবং তারা এক-আল্লাহর সাথে সাথে কিছু দেবমূর্তিরও উপাসনা করতে শুরু করে। আল্লাহর উপাসনা ছিল আদি বিশ্বাস, মূর্তিপূজা ছিল নব-উদ্ভাবন।

২. মুশরিক বা পৌত্তলিক আরবরা বিভিন্ন দুনিয়াবি দেবতার মূর্তির পূজা করত। তারা আল্লাহকে তারা কোনো দুনিয়াবি দেবতা মনে করত না; বরং মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও সবকিছুর মালিক মনে করত। কা'বার নির্মাতা ইবরাহিম (আ.) এর ইলাহ মনে করত।

৩. মক্কার পৌত্তলিকরা আল্লাহর কোনো মূর্তি বানায়নি। আল্লাহ মোটেও নব-উদ্ভাবিত ৩৬০ দেবতার এক দেবতা ছিলেন না।

৪. নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষে থেকে ওহী পেয়ে পুনরায় সেই আদি একত্ববাদী ধর্মাদর্শ (ইসলাম) প্রচার করতে শুরু করেন। এক আল্লাহর উপাসনা করতে আহ্বান জানান এবং সকল প্রকার মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করতে

---

[২৮১] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এই বইয়ের *"ইহুদিরা কি আসলেই উজাইর (Ezra)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে?"* শীর্ষক প্রবন্ধে

বলেন। আল কুরআনে বারংবার মুশরিকদের পৌত্তলিকতার অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে ও নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

৫. আল্লাহর নির্দেশে নবী মুহাম্মাদ ﷺ মুশরিকদের ধর্মের নব-উদ্ভাবনগুলো অপসারিত করেন এবং আদি সঠিক জিনিসগুলো বহাল রাখেন। এক আল্লাহর উপাসনা, হজের ইবরাহিমী রীতি—এগুলো সেই আদি একত্ববাদী ধর্মাদর্শের অংশ ছিল। সেগুলো নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তে বহাল থাকে।

৬. আরব মুশরিকদের পৌত্তলিকতার সাথে ইসলাম একমত হয়নি, তাদের নব-উদ্ভাবন মিশ্রিত স্রষ্টার ধারণাকে ইসলাম গ্রহণ করেনি। কুরআনে পুনর্বার তাদের পৌত্তলিকতাকে নাকচ করা হয়েছে। সেখানে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ইবরাহিমী ধর্মাদর্শে প্রত্যাবর্তন করতে। কাজেই আরব পৌত্তলিকরা জাহেলী যুগে যতই দেব-দেবীর উপাসনা করুক, তা দিয়ে ইসলামের উৎসকে পৌত্তলিক বলার উপায় নেই। তারা যদি চন্দ্রদেবতার উপাসনাও করে থাকত (প্রকৃতপক্ষে তারা তা করত না), সেটিও প্রমাণ করে না যে আল্লাহ হচ্ছেন চন্দ্রদেবতা। কেননা, ইসলামে স্পষ্টভাবে তাদের পৌত্তলিকতাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

মুসলিমরা কেন চাঁদ-তারা প্রতীক ব্যবহার করে?

এখন আরও একটি প্রশ্ন আসতে পারে, বিভিন্ন মুসলিম দেশের পতাকায় কেন একফালি চাঁদ (Crescent Moon) এবং তারার প্রতীক থাকে? এই জিনিসটি কেন ইসলামের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার হয়? এই চাঁদ-তারা প্রতীকের প্রচলনকে ইসলামবিরোধীরা 'চন্দ্রদেবতা' তত্ত্বের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করায়।

প্রথমেই একটি জিনিস বলে রাখি। কোনো সম্প্রদায় একটি প্রতীক ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে তারা সেই জিনিসের পূজা করে। খ্রিষ্টানরা তাদের গির্জায় ক্রুশের প্রতীক ব্যবহার করে। ইহুদিরা Star of David নামক ছয় কোনা তারার প্রতীক ব্যহার করে। এর অর্থ কি এই যে খ্রিষ্টানরা ক্রুশের পূজা করে বা ইহুদিরা তারার পূজা করে? ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে কিন্তু কেউ এই অভিযোগ তোলে না। অযৌক্তিকভাবে শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তোলা হয়।

চাঁদ তারার প্রতীক মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত আছে, এটা সত্য। কিন্তু মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত সব জিনিসই যে 'ইসলামী' এমন কোনো কথা নেই। চাঁদ-তারার এই প্রতীককে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হলে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে এর

পক্ষে দলিল দিতে হবে। কুরআন বা হাদিসের কোথাও চাঁদকে বা তারাকে ইসলামের প্রতীক বলা হয়নি। কোথাও চাঁদ-তারা প্রতীক ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়নি। নবী ﷺ কখনো এই প্রতীক ব্যবহার করেননি। এমনকি খুলাফায়ে রাশিদীন (প্রথম চার জন ন্যায়পরায়ণ খলিফা) এবং তাঁদের পরে উমাইয়া খলিফা—এদের কারও যুগেও মুসলিমদের মধ্যে চাঁদ-তারা প্রতীকের ব্যবহারের কোনো প্রমাণ নেই। এই খলিফাদের যুগের বেশ পরের সময় থেকে চাঁদ-তারা প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলামের সাথে সরাসরি এই প্রতীকের কোনো সম্পর্ক নেই। কাদের দ্বারা এই প্রতীকের প্রচলন মুসলিমদের মাঝে শুরু হয় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে। কারও কারও মতে পারস্যবাসীদের থেকে আবার কারও কারও মতে গ্রিকদের মাধ্যমে এই প্রতীক মুসলিমদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে।[২৮২] তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে তুর্কীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়। তুর্কী ঐতিহাসিকদের [যেমন : Mehmet Fuat Köprülü] মতে, প্রাচীনকাল থেকেই এশিয়ায় তুর্কীদের বিভিন্ন রাজ্যে একফালি চাঁদ (চাঁদ-তারা নয়) এর প্রতীকের প্রচলন ছিল।[২৮৩]

জার্মান প্রাচ্যবিদ Franz Babinger এর মতে,

> "It seems possible, though not certain, that after the conquest Mehmed took over the crescent and star as an emblem of sovereignty from the Byzantines. The half-moon alone on a blood red flag, allegedly conferred on the Janissaries by Emir Orhan, was much older, as is demonstrated by numerous references to it dating from before 1453. But since these flags lack the star, which along with the half-moon is to be found on Sassanid and Byzantine municipal coins, it may be regarded as an innovation of Mehmed. It seems certain that in the interior of Asia tribes of Turkish nomads had been using the half-moon alone as an emblem for some time past, but it is equally certain that crescent and star together are attested only for a much later period. There is good reason to believe that old Turkish and Byzantine

---

[২৮২] ■ *তারাতিব আল ইদারিয়্যাহ*, আল কিত্তানী, ১/৩২০
■ "Taking the crescent as a symbol – islamQA (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)" https://islamqa.info/en/1528/

[২৮৩] *Some Observations On The Influence Of Byzantine Institutions On Ottoman Institutions*, Mehmet Fuat Köprülü, Gary Leiser (trans.), Page 118

traditions were combined in the emblem of Ottoman and, much later, present-day Republican Turkish sovereignty."[২৮৪]

অর্থাৎ, সাধারণভাবে তুর্কী যাযাবর গোত্রগুলো তাদের রাজ্যের জন্য অর্ধচন্দ্রের প্রতীক ব্যবহার করত। তবে সেই প্রতীকে চাঁদ-তারা একত্রে ছিল না। তারার প্রতীক ছিল (পারস্যের) সাসানীয় এবং বাইজানটাইনদের মুদ্রায়। ১৪৫৩ সালে বাইজানটাইন (পূর্ব রোম সাম্রাজ্য) বিজয়ের পর উসমানী সুলতান মেহমেদ [মুহাম্মাদ আল ফাতিহ (র.)] তাদের থেকে চাঁদ-তারা প্রতীকের ব্যবহার শুরু করেন। এভাবে উসমানী তুর্কীদের মধ্যে চাঁদ-তারা প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়ে যায় এবং আরও পরে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্রেও এই প্রতীক ব্যবহার হয়।

*এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*তেও অনুরূপ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮৫]

চিত্র : বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে প্রচলিত চাঁদ-তারা প্রতীক[২৮৬]

উসমানীরা (Ottomans) কয়েক শত বছর পুরো মুসলিম উম্মাহর নের্তৃত্ব দিয়েছে এবং তারাই মুসলিম উম্মাহর খলিফার মর্যাদায় ছিল। দীর্ঘদিন তাদের শাসনের ফলে তাদের সরকারি প্রতীক পুরো মুসলিম বিশ্বে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে যায়। মসজিদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ জায়গায় খলিফার প্রতীক ব্যবহার হতে থাকে। মসজিদে এই প্রতীক ব্যবহারের আরও একটি কারণ আছে। খ্রিষ্টানরা তাদের গির্জায় ক্রুশের প্রতীক ব্যবহার

---

[২৮৪] *Mehmed the Conqueror and His Time*, Franz Babinger, Page 108

[২৮৫] "Crescent Symbol - Encyclopædia Britannica" https://www.britannica.com/topic/crescent-symbol

[২৮৬] "Star and crescent - Wikiwand.html" http://www.wikiwand.com/en/Star_and_crescent

করত। এর দেখাদেখি মুসলিমরাও মসজিদে কোনো একটা প্রতীকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল।[২৮৭] এই প্রতীক স্থায়ী হবার পেছনে ইসলামী চান্দ্র বর্ষপঞ্জিরও একটা ভূমিকা আছে। হিজরী বর্ষপঞ্জিকা চাঁদের অবস্থানের মাধ্যমে গণনা করা হয়। এ ছাড়া রমযান এবং ঈদের সময়েও নতুন চাঁদের একটা বিশাল ভূমিকা থাকে মুসলিম বিশ্বে। এসব কারণে চাঁদ-তারার প্রতীক মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয়।

ইসলামের প্রতীক হিসাবে চাঁদ-তারা ব্যবহারের শরয়ী বিধান কী? যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহতে এই প্রতীক ব্যবহারের কোনো উল্লেখ নেই, ইসলামী শরিয়তে এই প্রতীকের তাই কোনো ভিত্তি নেই। অনেক আলেম একে বিদআত (নব-উদ্ভাবন) বলে অভিহিত করেছেন। তা ছাড়া এই প্রতীক ব্যবহারের ফলে বিজাতীয়দের সাদৃশ্য অবলম্বনেরও আশঙ্কা সৃষ্টি হয়; কেননা, অনেক পৌত্তলিক জাতি আছে যারা এ-জাতীয় মহাজাগতিক বস্তুর পূজা করে। কাজেই এই প্রতীক না ব্যবহার করাই সংগত।[২৮৮]

আমরা দেখলাম, কুরআন-সুন্নাহর সাথে চাঁদ তারা কিংবা একফালি চাঁদের প্রতীকের কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রতীক তুর্কী যাযাবর ও পরে উসমানী সাম্রাজ্যের দ্বারা মুসলিমবিশ্বে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এমন একটি বিষয়কে চন্দ্রদেবতা তত্ত্বের 'প্রমাণ' হিসাবে পেশ করার কোনোরূপ যৌক্তিকতা নেই।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ এবং আল্লাহ

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত জিনিসে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রসঙ্গ বিবেচনা করলে বলা যায়, সেখানে যে স্রষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমরা মুসলিমরাও সেই একই স্রষ্টার উপাসনা করি। যদিও তাদের প্রতি যে কিতাব নাজিল করা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে গেছে এবং তাতে স্রষ্টা সম্পর্কেও অনেক ভুল তথ্য আছে, তথাপি তাদের গ্রন্থে সাধারণভাবে সত্য সৃষ্টিকর্তার উপাসনার কথাই বলা হয়েছে। খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদ (Trinity) এ বিশ্বাসী হলেও বাইবেলে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। বাইবেলে বারংবার God-কে Abraham, Isaac ও Jacob

---

[২৮৭] "Taking the crescent as a symbol – islamQA (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)" https://islamqa.info/en/1528/

[২৮৮] "Putting a crescent on top of the minaret of a mosque – islamQA (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)"
https://islamqa.info/en/575/

এর প্রভু হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮৯] আমরা মুসলিমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি যে, আমরাও ইবরাহিম (আ.), ইসহাক (আ.) এবং ইয়া'কুব (আ.) এর ইলাহ মহান আল্লাহ তা'আলার উপাসক। প্রাচীন সেসব নবীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, আমরা সেগুলোতেও বিশ্বাসী। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

> অর্থ : আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) সাথে বিতর্ক কোরো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুলুম করেছে। আর তোমরা বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি **এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই।** আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী।'[২৯০]

যদিও অনেক খ্রিষ্টান মিশনারি এবং নাস্তিক-মুক্তমনারা এই ব্যাপারটি মানতে নারাজ! প্রবন্ধের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আরবি ভাষায় যেমন মহান স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, হিব্রু ভাষায় এর সমজাতীয় শব্দ 'এলোহিম' (אלהים) এবং 'এলোয়াহ' (אלוה), যা বাইবেলে রয়েছে। এর উৎপত্তি মূল শব্দ 'এল' থেকে। বাইবেলীয় অ্যারামায়িক ভাষায় এর সমজাতীয় শব্দ 'এলাহা' (ܐܠܗܐ) এবং সিরিয়াক ভাষায় এর উচ্চারণ হয় 'আলাহা' (ܐܰܠܳܗܳܐ)। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের সাথে সম্পর্কিত এই ভাষাগুলো। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে 'Allah' শীর্ষক আর্টিকেলে বলা হয়েছে :

> "The name's origin can be traced to the earliest Semitic writings in which the word for god was il or el, the latter being used in the Hebrew Bible (Old Testament). **Allah is the standard Arabic word for God and is used by Arabic-speaking Christians and Jews as well as by Muslims regardless of their native tongue.**"[২৯১]

---

[২৮৯] *বাইবেল*, যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৩ : ৬, মথি (Matthew) ২২ : ৩২ এবং আরও অনেক স্থানে

[২৯০] *আল কুরআন*, আনকাবুত, ২৯ : ৪৬

[২৯১] "Allah - Encyclopædia Britannica" https://www.britannica.com/topic/Allah

অর্থাৎ, আল্লাহর নামের উৎস পাওয়া যেতে পারে প্রাচীন সেমিটিক লেখনীতে, যেখানে উপাস্যের জন্য 'ইল' অথবা 'এল' শব্দ ব্যবহার করা হতো। হিব্রু বাইবেল অর্থাৎ বাইবেলের পুরোনো নিয়ম (Old Testament) অংশে 'এল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। **আরবিভাষী ইহুদি, খ্রিষ্টানদের নিকট স্রষ্টা বোঝানোর জন্য 'আল্লাহ' হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড শব্দ।** আর যেকোনো ভাষাভাষী মুসলিমের জন্য এটি স্ট্যান্ডার্ড শব্দ।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, পৌত্তলিক আরবদের নিকটেও আল্লাহ কোনো পার্থিক দেবমূর্তির নাম ছিল না; বরং সারা বিশ্বের স্রষ্টা এবং ইবরাহিম (আ.) এর উপাস্য হিসাবে বিবেচিত হতেন। শুধু পৌত্তলিক আরবরাই নয়, আল্লাহর উপাসনা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দুই আবরাহামিক ধর্মের অনুসারী ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আরবিভাষী ইহুদি, খ্রিষ্টান সকলেই স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' বলে ডাকে। বর্তমানে ইরাক, সিরিয়া, মিসর, লেবানন—এসব দেশে লক্ষ লক্ষ আরবিভাষী খ্রিষ্টান বাস করে। তাদের ধর্মগ্রন্থ আরবি *বাইবেলেও* God এর স্থলে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[২৯২] তারাও ইবরাহিম (আ.) এর উপাস্য মহান সত্তাকে 'আল্লাহ' বলে ডাকে।

Chapter 1 مَقْطَع

1 أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ: 2 وَالأَرْضُ، كَانَتْ غَامِرَةً وَمُسْتَبْحِرَةً، وَظَلامٌ عَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ، وَرِيَاحُ اللّٰهِ تَهُبُّ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ: 3 شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونَ نُورٌ، فَكَانَ نُورٌ: 4 فَلَمَّا عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّ النُّورَ جَيِّدٌ، فَصَلَ بَيْنَ النُّورِ وَالظَّلامِ: 5 وَسَمَّى اللّٰهُ أَوْقَاتَ النُّورِ نَهَارًا، وَأَوْقَاتَ الظَّلامِ لَيْلاً. وَلَمَّا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَوْمٌ وَاحِدٌ: 6 شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونَ جَلَدٌ فِي وَسَطِ الْمَاءِ، وَيَكُونُ فَاصِلاً بَيْنَ الْمَاءَيْنِ: 7 فَصَنَعَ اللّٰهُ الْجَلَدَ، وَفَصَلَ بَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي مِنْ دُونِهِ، وَالْمَاءِ الَّذِي مِنْ فَوْقِهِ، فَكَانَ كَذَاكَ: 8 وَسَمَّى اللّٰهُ الْجَلَدَ سَمَاءً، وَلَمَّا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَوْمٌ ثَانٍ:

চিত্র : ইহুদি পণ্ডিত সাদিয়া গাওন কর্তৃক *বাইবেলের* ৯ম শতকের সুপ্রাচীন আরবি অনুবাদ। সেই অনুবাদের ১ম পৃষ্ঠায় [আদিপুস্তক (Genesis) ১ম অধ্যায়] 'আল্লাহ' নামের ব্যবহার

---

[২৯২] অনলাইন আরবি *বাইবেল* থেকে সহজেই চেক করে দেখা যেতে পারে।
https://www.wordproject.org/bibles/ar/

যেসব খ্রিষ্টান প্রচারক এবং ইসলামবিরোধী নাস্তিক অ্যাক্টিভিস্ট বলতে চান যে, মুসলিমদের আল্লাহ কোনো আবরাহামিক স্রষ্টা না; বরং আরবীয় পৌত্তলিক দেবতা (!) তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : আরবিভাষী ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাহলে কেন সেই যুগে এবং আজও নিজ স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' বলে ডাকে? তারাও কি তবে পৌত্তলিক দেবতা কিংবা 'Moon god' এর উপাসক?!!

পশ্চিমা খ্রিষ্টান প্রচারকদের লাগামহীন ইসলামবিরোধী ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে যে আজেবাজে তত্ত্ব প্রচার করা হয়, এতে শুধু মুসলিমরা যে আক্রান্ত হচ্ছে তা নয়। আরবিভাষী খ্রিষ্টানরাও এর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিষ্টান ইভানজেলিস্টরা যখন দিন-রাত আল্লাহ তা'আলাকে Moon god বলে প্রচার করে যায়, তখন আরব খ্রিষ্টানরা নিজ ভাষার বাইবেল খুলে 'আল্লাহ' নাম দেখে খুব বিব্রত হয়। আরব খ্রিষ্টানরা খুব ভালো করেই জানে যে আল্লাহকে 'চন্দ্রদেবতা' বলা কত বড় মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। এ কারণে আরব খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের কাউকে কাউকে স্বধর্মের লোকদের এই বানোয়াট তত্ত্বের প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। প্রখ্যাত আরব খ্রিষ্টান পণ্ডিত এবং Arabic Bible Outreach এর পরিচালক মাইকেল আব্দিল মাসিহ বলেন,

> **It is an unproven theory, so it may well be false.** Even if it turns out to be true, it has little bearing on the Muslim faith since **Muslims do not worship a moon god. That would be blasphemy in Islamic teachings. If we use the moon-god theory to discredit Islam, we discredit the Christian Arabic speaking churches and missions throughout the Middle East. This point should not be discounted lightly because the word Allah is found in millions of Arabic Bibles and other Arabic Christian materials. The moon-god theory confuses evangelism.** When Christians approach Muslims, they do not know whether they need to convince them that they worship the wrong deity, or to present them the simple Gospel message of our Lord Jesus Christ.
>
> **As far as the moon symbol on the mosques or on the flags, the simple reason behind it is that Islam depends on the moon for their religious calendar (lunar calendar) specially during the Ramadan (month of fasting). Islam forbids**

symbols or pictures of God.[২৯৩]

অর্থাৎ **এটি একটি অপ্রমাণিত তত্ত্ব এবং খুব সম্ভব মিথ্যা।** এটা যদি সত্য হয়েও থাকে, তাহলেও ইসলামী বিশ্বাসে তা খুব তুচ্ছ প্রভাব রাখতে পারে; কারণ, **মুসলিমরা কোনো চন্দ্রদেবতার উপাসনা করে না। এমন কিছু করা ইসলামে ঈশ্বরনিন্দার পর্যায়ে পড়ে।** আমরা (খ্রিষ্টানরা) যদি ইসলামকে হেয় করার জন্য এই চন্দ্রদেবতা তত্ত্ব ব্যবহার করি, তাহলে এটা বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে খ্রিষ্টান আরবিভাষী চার্চগুলো এবং মিশনারিগুলোকেই হেয় করা হবে। এই ব্যাপারটি মোটেও খাটো করে দেখার মতো কিছু না; কারণ, **'আল্লাহ' শব্দটি লক্ষ লক্ষ আরবি বাইবেল ও অন্যান্য খ্রিষ্টীয় বইপুস্তকে পাওয়া যায়।** এই চন্দ্রদেবতা তত্ত্ব খ্রিষ্টধর্মের প্রচারকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিচ্ছে।...**মসজিদ এবং পতাকায় চাঁদের প্রতীকের কারণ হচ্ছে, মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় বর্ষপঞ্জির জন্য বিশেষ করে রমযান মাসে চাঁদের ওপর নির্ভর করে। ইসলামে ঈশ্বরের কোনো প্রকারের প্রতীক বা ছবি বানানো নিষিদ্ধ।**

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাবার নাম 'আব্দুল্লাহ' প্রসঙ্গ

অনলাইনে আরও একটি জিনিস প্রায়ই দেখা যায়, নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাবার নাম 'আব্দুল্লাহ' ছিল, এই ব্যাপারটিকে সামনে এনে নাস্তিক-মুক্তমনারা মুসলিমদের দিকে তীর্যক প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। তারা বলে : মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, যার মানে হচ্ছে : আল্লাহর দাস। নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাবা ছিলেন মুশরিক,[২৯৪] আল্লাহকে সে যুগের মুশরিকরাও উপাসনা করত। এখন মুসলিমরা আল্লাহর উপাসনা করে। মুশরিকদের এই নাম হতো, এখন মুসলিমদেরও এই নাম হয়। মুসলিমরা কি তাহলে সেই পৌত্তলিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নয়?

এ ব্যাপারে যা বলব : আমরা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ মোটেও আরবের মুশরিকদের পূজিত কোনো পার্থিব দেবমূর্তি ছিলেন না; বরং আরবের মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলাকে সারা জাহানের স্রষ্টা, সকল কিছুর

---

[২৯৩] "The word Allah and Islam - Arabic Bible Outreach Ministry"
https://www.arabicbible.com/for-christians/1810-the-word-allah-and-islam.html

[২৯৪] ■ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা কোথায় আছেন (জান্নাতে না জাহান্নামে)? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, জাহান্নামে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি যখন পেছনে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি ডাকলেন এবং বললেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।" [*সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং ৩৯৪]
■ *ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ফিকহুল আকবার (বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা)* : খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র.), পৃষ্ঠা : ৪৭৭-৪৮৮

মালিক এবং ইবরাহিম (আ.) এর ইলাহ মনে করত। তাদের বিশ্বাসের এই জায়গাটি সঠিক ছিল। ইসলাম তাদের বিশ্বাসের সঠিক জিনিসটির বিরোধিতা করেনি, নব-উদ্ভাবিত মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছে ও সেগুলো অপসারণ করেছে। ইসলাম কখনো সঠিক জিনিসের বিরোধিতা করে না। 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহর দাস) নামের মাঝে কোনো সমস্যা নেই। এটি যথার্থ ও সুন্দর একটি নাম। যথার্থই সকল মানুষ মহান আল্লাহর দাস; বরং হাদিসে এই নামকে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় নামের একটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯৫]

আর 'আব্দুল্লাহ' যে শুধু আরবের পৌত্তলিকদেরই নাম হতো—ব্যাপারটা এমন নয়। আমরা ইতিমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ শুধু আরবের পৌত্তলিকদের নয়; বরং আরবের ইহুদি, খ্রিষ্টান এই সব Abrahamic ধর্মের মানুষদেরও উপাস্য-প্রভু হিসাবেও বিবেচিত হতেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আরবের ওইসব ধর্মের লোকদের নামও 'আব্দুল্লাহ' হতো। *সিরাত ইবন হিশামে* নবী ﷺ-এর যুগে আরবের ইহুদি পণ্ডিতদের নামের যে তালিকা আছে, এর মধ্যে দুই জনের নাম 'আব্দুল্লাহ'। তারা হচ্ছেন, সে যুগে হিজাজের ভূমিতে *তাওরাতের* সবচেয়ে বড় পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবন সুরিয়া আল আওয়ার এবং অন্যজন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবন সায়ফ (কারও কারও মতে আব্দুল্লাহ ইবন যায়ফ)।[২৯৬] কাজেই 'আব্দুল্লাহ' শুধু আরব পৌত্তলিকদের নাম হতো—এটা একটা অসার কথা। মহান স্রষ্টার দাস—এভাবে নাম রাখা একটি সুপ্রাচীন Abrahamic ঐতিহ্য। হিব্রু ভাষাতে 'আব্দুল্লাহ' এর সমজাতীয় নাম হচ্ছে : 'আব্দিয়েল'। হিব্রুভাষী ইহুদিদের এমন নাম হয়। *বাইবেলেও* এমন নামের উল্লেখ আছে।[২৯৭] *বাইবেলে* উল্লেখ আছে বলে অনেক খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরও এমন নাম দেখা যায়।[২৯৮] সেই 'আব্দিয়েল' নামেরই আরবি সমজাতীয় নাম 'আব্দুল্লাহ'। আব্দুল্লাহ হচ্ছে Abrahamic নাম। ইসলাম হচ্ছে Abrahamic ধারার চূড়ান্ত ও বিশুদ্ধতম ধর্ম বিশ্বাস। "আব্দুল্লাহ একটি পৌত্তলিক নাম"—এই কথা বললে ইহুদিদের ঈশ্বর তথা বাইবেলের ঈশ্বর 'পৌত্তলিক' হয়ে যাচ্ছেন; কেননা, আরবের ইহুদি পণ্ডিতদের এমন নাম হতো। ইহুদি আর খ্রিষ্টান উভয়েই *বাইবেলের* পুরোনো নিয়ম বা Old testament অংশে বিশ্বাসী। কাজেই 'আব্দুল্লাহ' নাম নিয়ে

---

[২৯৫] "...আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। ..." [*যাদুল মা'আদ, নাসাঈ, আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং : ৮২১; *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং : ৪৭৮২]

[২৯৬] *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) পৃষ্ঠা : ১৯২

[২৯৭] "অন্য এক পরিবারের নেতা অহির পিতার নাম আব্দিয়েল। তিনি ছিলেন গূনির পুত্র।" [*বাইবেল*, ১ বংশাবলী (১ Chronicles) ৫ : ১৫]

[২৯৮] "Abdiel - Wikipedia"
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdiel

অভিযোগ তোলার আগে খ্রিষ্টান মিশনারিদের উচিত এই দিকটিও বিবেচনায় রাখা!

কুরআন-হাদিস এবং চন্দ্রদেবতা

আপনি যদি কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস পোষণ করার অভিযোগ আনতে চান, তাহলে এর স্বপক্ষে সেই ব্যক্তি বা দলের থেকে বক্তব্য নিয়ে আসতে হবে। যদি এর স্বপক্ষে বক্তব্য না পাওয়া যায়, তাহলে বোঝা যাবে সে অভিযোগ মিথ্যা। আর যদি এর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে, অভিযোগ যে শুধু মিথ্যা তা-ই না, সেই সাথে এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা, যেখানে মূল সত্যের বিপরীত জিনিস এনে অভিযোগ করা হয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে এত "চন্দ্রদেবতা উপাসনা"-এর অভিযোগ আনা হয়, *আল কুরআন* বা হাদিসে কি এর স্বপক্ষে কোনো বক্তব্য আছে? আল কুরআন ও হাদিসে কি চাঁদকে আলাদা কোনো ঐশ্বরিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

> অর্থ : তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান? **তিনি চাঁদ-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত;** তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[২৯৯]

আলোচ্য আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে—আল্লাহই চাঁদ-সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন, যারা একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিচরণ করে। চাঁদকে দেবতা বলা তো অনেক দূরের কথা, *কুরআনে* বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, চাঁদ-সূর্য এগুলোর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, আল্লাহই এদের নিয়ন্ত্রক। এখানে চাঁদকে নয়; বরং আল্লাহকেই ক্ষমতাবান বলা হয়েছে। *আল কুরআনে* আরও বলা হয়েছে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

> অর্থ : তোমার নিকট তারা জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে **এটি মানুষের জন্য সময় (মাসসমূহ) নির্ধারণ এবং হজের সময় ঠিক করার মাধ্যম।...**[৩০০]

---

[২৯৯] *আল কুরআন*, লুকমান, ৩১ : ২৯

[৩০০] *আল কুরআন*, বাকারাহ, ২ : ১৮৯

আলোচ্য আয়াতে নতুন চাঁদের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এর ভূমিকা হচ্ছে মানুষের সময় গণনায় সহায়ক হওয়া। সময় গণনার সহায়ক হওয়া আর উপাস্য দেবতা হওয়া কি এক হলো?

আল কুরআনের একটি আয়াত আছে, যা চন্দ্রদেবতা তত্ত্বকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট বলে প্রমাণ করে। আয়াতটি হলো :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

> অর্থ : তাঁর [আল্লাহ] নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। **তোমরা সূর্যকে সিজদাহ কোরো না, চাঁদকেও নয়। সিজদাহ করো আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন—যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত করো।**[৩০১]

এখানে সরাসরি বলে দেওয়া হলো সূর্য বা চাঁদ কারও উপাসনা না করতে, শুধু এদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদত করতে।

শুধু চন্দ্রের উপাসনাই না, ইসলামে প্রাচীন আরবের সকল প্রকার মূর্তিপূজা এবং পৌত্তলিকতাকে একদম বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ①

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ②

> অর্থ : বলো, **হে কাফিরেরা, আমি আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা করো।**[৩০২]

> আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব (রা.) ওই দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেন, যাতে (রোমের বাদশাহ) হিরাক্লিয়াসের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন (তখন তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেননি) তিনি, অর্থাৎ নবী ﷺ তোমাদের কোন কাজের আদেশ করছেন?

> আবু সুফিয়ান বলেন, "আমি বললাম : তিনি [মুহাম্মাদ ﷺ] বলছেন যে, তোমরা মাত্র এক আল্লাহর উপাসনা করো, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার কোরো না এবং **ওইসব কথা পরিহার করো, যা তোমাদের বাপ-দাদারা বলত।**

---

[৩০১] *আল কুরআন,* হা-মিম সিজদাহ (ফুসসিলাত), ৪১ : ৩৭

[৩০২] *আল কুরআন,* কাফিরুন, ১০৯ : ১-২

আর তিনি আমাদের সলাত (নামায) পড়া, সত্য কথা বলা, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ দেন।[৩০৩]

যারা সূর্য বা চন্দ্রের উপাসনা করে, অথবা অন্য মিথ্যা উপাস্যদের পূজা করে, কিয়ামতের দিন তারা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতদের মধ্যে শামিল থাকবে না; বরং তারা আলাদাভাবে থাকবে এবং জাহান্নামে যাবে। মুক্তি পাবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই) কালিমার ঘোষণা দেওয়া মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মত।

> "...তখন যারা সূর্যের উপাসনা করত, তারা সূর্যের সাথে থাকবে। **যারা চন্দ্রের উপাসনা করত, তারা চন্দ্রের সাথে থাকবে।** আর যারা তাগুতের (মিথ্যা উপাস্য) উপাসনা করত, তারা তাগুতের সাথে জমায়েত হয়ে যাবে। কেবল এ উম্মত অবশিষ্ট থাকবে।...
>
> ...এরপর আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা হতে অবসর হলে স্বীয় রহমতে কিছুসংখ্যক জাহান্নামীকে (জাহান্নাম হতে) বের হতে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন তখন ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন, **যারা কালিমায় বিশ্বাসী ও শিরক করেনি, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা রহম করতে চাইবেন যে, তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। আর যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করতে চেয়েছেন তারা ওই সকল লোক, যারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই) বলত।...**"[৩০৪]

প্রিয় পাঠক লক্ষ করুন, ইসলামে সরাসরি বলা হচ্ছে চন্দ্রকে সিজদাহ না করতে। সেই সাথে সকল প্রকার পৌত্তলিকতাকে নাকচ করে দেওয়া হলো। যারা চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির উপাসনা করে, তাদের জাহান্নামী হবার কথা বলা হলো, শুধু এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসকদের মুক্তির কথা ঘোষিত হলো। অথচ ইসলামবিরোধীরা অভিযোগ করে, মুসলিমরা এক প্রাচীন চন্দ্রদেবতার উপাসনা করে। মূল সত্যের সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস দাবি করে অভিযোগ। তাদের এসব অভিযোগ যে কত বড় ষড়যন্ত্র আর ধাপ্পাবাজি তা কি এবার বোঝা যাচ্ছে?

বাইবেলে 'চন্দ্র উৎসব' এবং ঈশ্বরের বন্দনা

আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক

---

[৩০৩] *সহীহ বুখারী*, ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ৩১৭৪, ৪৫৯৩; *সহীহ মুসলিম*, ১৭৭৩; *তিরমিযি*, ২৭১৭; *আবু দাউদ*, ৫১৩৬; *মুসনাদ আহমাদ*, ২৩৬৬

[৩০৪] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ৩৪৮

'চন্দ্রদেবতা তত্ত্ব' প্রচার করায় কীভাবে ভূমিকা রেখেছে খ্রিষ্টান মিশনারিরা। আমরা এটাও দেখেছি যে, আল কুরআন কিংবা হাদিসে চাঁদকে মোটেও আলাদা গুরুত্ব দিয়ে সম্মান করা হয়নি, উপাস্য বানানো তো অনেক দূরের কথা। শুধু চাঁদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ *বাইবেলে* চাঁদ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হচ্ছে, খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ *বাইবেল* ঘাঁটলে দেখা যায় সেখানে নতুন চাঁদ দেখে উৎসব করতে বলা হয়েছে! শুধু তা-ই না, ঈশ্বরের বন্দনা করতে চাঁদের জন্য শিঙ্গা (একধরনের বাঁশি) বাজাতে বলা হয়েছে! *বাইবেলে* চাঁদ এমনই একটি বিশেষ জিনিস :

> **"Sing for joy to God our strength; shout aloud to the God of Jacob!** Begin the music, strike the timbrel, play the melodious harp and lyre. **Sound the ram's horn at the New Moon, and when the moon is full, on the day of our festival; this is a decree for Israel, an ordinance of the God of Jacob."** [New International Version (NIV)]

> "সুখী হও এবং **আমাদের শক্তিদাতা ঈশ্বরের কাছে গান** গাও। যাকোবের (ইস্রায়েল) ঈশ্বরের কাছে আনন্দ-ধ্বনি দাও। সংগীত শুরু করো, খঞ্জনিগুলো বাজাও, সুশ্রাব্য বীণা এবং অন্যান্য তন্ত্রবাদ্য বাজাও। **নতুন চাঁদের জন্য মেষের শিঙ্গা বাজাও। পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের সময় যখন আমাদের ছুটির উৎসব হয় তখন মেষের শিঙ্গা বাজাও। ইস্রায়েলের লোকের জন্য এটাই বিধি। যাকোবের ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা।**[৩০৫]

প্রিয় পাঠক, *কুরআন*-হাদিসে কোথায় নতুন চাঁদ কিংবা পূর্ণিমার চাঁদ দেখে শিঙ্গা বাজাতে বলা হয়নি; বরং তা বলা হয়েছে বাইবেলে। অথচ চন্দ্রদেবতা তত্ত্বের অভিযোগ খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তোলা হয় না, ইসলামের বিরুদ্ধে তোলা হয়! বাইবেল থেকে আরও কিছু উদ্ধৃতি দেখুন :

> "Also at your times of rejoicing—**your appointed festivals and New Moon feasts—you are to sound the trumpets over your burnt offerings and fellowship offerings, and they will be a memorial for you before your God.** I am the LORD your God." [NIV]

এ ছাড়াও তোমার বিশেষ সভার সময়, **নতুন চাঁদের দিনগুলোতে এবং**

---

[৩০৫] *বাইবেল*, গীতসংহিতা [সামসংগীত/জবুর শরীফ/Psalms] ৮১ : ১-৪

তোমাদের সকলের সুখের সমাবেশে এই শিঙ্গা দুটি বাজাবে। তুমি যখন তোমার হোমবলি এবং মঙ্গল নৈবেদ্য প্রদান করবে সেই সময়ও শিঙ্গা দুটি বাজাবে। প্রভু, তোমার ঈশ্বর তোমাকে যেন মনে রাখেন, সে জন্যই এই বিশেষ পদ্ধতি। এটি করার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করছি; আমিই প্রভু তোমার ঈশ্বর।"[৩০৬]

"After that, **they presented the regular burnt offerings, the New Moon sacrifices and the sacrifices for all the appointed sacred festivals of the LORD,** as well as those brought as freewill offerings to the LORD. [NIV]

তারপর **তারা প্রতিদিন নিত্য হোমবলি উৎসর্গ করা শুরু করল, এবং নতুন চাঁদের** (বা অমাবস্যার) **উৎসবের জন্য, অন্যান্য সমস্ত ছুটির দিনের জন্য এবং ঈশ্বরের আদেশকৃত উৎসবের দিনগুলোর জন্য উৎসর্গ করতে লাগল।** লোকরা প্রভুকে বিশেষ উপহারগুলোর মধ্যে যেকোনো উপহার দিতে শুরু করল, যা তারা প্রভুকে দিতে চাইত।[৩০৭]

এখানে দেখা যাচ্ছে, *বাইবেলে* চাঁদকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। *বাইবেলে* নতুন চাঁদ বা অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র দেখলে সে সময়ে শিঙ্গা বাজাতে বলা হচ্ছে। এভাবে ঈশ্বরকে বন্দনা করতে বলা হচ্ছে এবং একটি বিশেষ উৎসব পালন করতে বলা হচ্ছে। শুধু তা-ই না, সে সময়ে বিশেষ হোমবলি এবং মঙ্গল নৈবেদ্য প্রদানের কথাও বলা হচ্ছে! প্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন, যারা মুসলিমদের 'চন্দ্র দেবতার উপাসক' বলতে চায়, তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থের কীরূপ অবস্থা। চাঁদকেন্দ্রিক এই কথাগুলো আছে *বাইবেলের* পুরোনো নিয়ম অংশে যাকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায় ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করে। *বাইবেলের* নতুন নিয়ম (New Testament) অংশে যিশুখ্রিষ্ট বনী ইস্রাঈলের সকল আইন ও বিধানকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি এগুলো পূর্ণ করতে এসেছেন বলে দাবি করেছেন। এগুলো মেনে চলতে বলেছেন।[৩০৮] শুধু তা-ই না, *বাইবেলের* নতুন নিয়মেও (New Testament) দেখা যায় যে, প্রাচীন খ্রিষ্টানদের সময়েও এই নতুন চাঁদের পর্ব উদ্‌যাপন ছিল।

"Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, **a New Moon celebration** or a Sabbath day."

---

[৩০৬] *বাইবেল*, গণনাপুস্তক [Numbers] ১০ : ১০

[৩০৭] *বাইবেল*, ইয্রা [Ezra] ৩ : ৫

[৩০৮] *বাইবেল*, মথি (Matthew) ৫ : ১৭-২০ দ্রষ্টব্য

“তোমরা কী খাও, পান করো, বা কোন পর্ব পালন করো, **নতুন চাঁদের পর্ব উদ্‌যাপন করো,** বিশ্রামবারের বিশেষ দিনগুলো পালন করো—এ নিয়ে কেউ যেন তোমাদের বিচার না করে।”[৩০৯]

এখানে আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে পৌত্তলিকরা নতুন চাঁদের বা অমাবস্যার সময়ে তাদের দেবতা মারদুকের বন্দনা করে ‘আকিটু’ (Akitu) উৎসব পালন করত।[৩১০] এখন কেউ যদি চাঁদ-সম্পর্কিত এই সাদৃশ্য দেখিয়ে দাবি করা শুরু করে যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বরের ধারণা এসেছে মেসোপটেমিয়ার পৌত্তলিকদের থেকে, তাহলে ব্যাপারটি কেমন দাঁড়াবে? যেসব মানুষেরা ইসলামের নামে অপবাদ আরোপ করতে চায়, তারা যেন একই নিক্তি দিয়ে নিজেদের ব্যাপারগুলোও পরিমাপ করে।

শেষ কথা

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা পৌত্তলিকতার অভিযোগ তোলে, তাদের ইতিহাসজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান উভয়েরই অভাব রয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি প্রাচীন আরবের পৌত্তলিকতাকেই বহাল রাখতেন, তাহলে আরব মুশরিকদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল কী নিয়ে? ইসলামের ইতিহাস নিয়ে যাদের সামান্যও জ্ঞান আছে তারা জানে যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য নবী করিম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মাক্কী যুগে কী ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। শুধু মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যে রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় সাথীদেরকে হারিয়েছেন। হারিয়েছেন প্রাণপ্রিয় আত্মীয়দের। সমাজ তাঁকে বয়কট করেছে। দেশ থেকে মানুষজন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মরুভূমির তপ্ত রোদে সাহাবীদের বুকে পাথর বেঁধে নির্যাতন করা হয়েছে। দেশত্যাগ করে তাদের আবিসিনিয়া ও মদীনায় পাড়ি জমাতে হয়েছে। কিসের জন্য? কোনো ক্ষমতার জন্যে নয়, সম্পদের জন্যও নয়। শুধু তাওহিদের প্রশ্নে আপসহীনতার জন্য। আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য। পাথরের তৈরি কোনো মূর্তির সামনে মাথা না ঝোঁকানোর জন্যে। সেটা হুবাল, লাত, উযযা—যা-ই হোক না কেন।

---

[৩০৯] *বাইবেল, কলসীয়* (Colossians) ২ : ১৬

[৩১০] ■ “5 Ancient New Year's Celebrations - HISTORY”
https://www.history.com/news/5-ancient-new-years-celebrations
■ “The Ancient Akitu Festival and the Humbling of the King” By April Holloway
https://www.ancient-origins.net/news-general-human-origins-religions/babylonian-akitu-festival-and-humbling-king-002128

আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে উপাস্য হিসাবে মেনে নিলে আল্লাহর রাসূল ও সাহাবীদের এত ত্যাগ-তিতিক্ষা, অশ্রু বিসর্জনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে রব হিসাবে মানত। তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে বলেছেন,

> "বলো, 'তোমরা যদি জানো তবে বলো, 'এ যমীন ও এতে যারা আছে, তারা কার?'
>
> সাথে সাথেই তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বলো, 'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'
>
> বলো, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহান আরশের রব?'
>
> তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'
>
> বলো, 'তিনি কে, যাঁর হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই? যদি তোমরা জানো।'
>
> তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ?'
>
> বরং আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছেয়েছি, আর নিশ্চয়ই তারা তো মিথ্যাবাদী।"[৩১১]

---

[৩১১] *আল কুরআন*, মু'মিনুন, ২৩ : ৮৪-৯০

তাদের একত্ববাদে (ইসলাম) ফিরে আসার আহ্বান,[৩১৬] নবী ইয়ারমিয়া (যিরমিয়) কর্তৃক সে সময়ের মূর্তিপূজক ইহুদিদের একত্ববাদে ফিরে আসবার আহ্বান,[৩১৭] নবী হিজকিল (যিহিষ্কেল) এর ঘটনা।[৩১৮]

ইহুদিদের নিজ ধর্মগ্রন্থ এ ব্যাপারে যা বলে তার একটা উদাহরণ :

> "মাবুদ তাঁর সমস্ত নবী ও দর্শকদের মধ্য দিয়ে ইসরাঈল ও এহুদাকে এই বলে সাবধান করেছিলেন, "তোমরা তোমাদের খারাপ পথ থেকে ফেরো এবং সমস্ত শরীয়ত, যা আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনের জন্য দিয়েছিলাম আর আমার গোলামদের, অর্থাৎ নবীদের মধ্য দিয়ে তোমাদের জানিয়েছিলাম তোমরা সেই অনুসারে আমার সমস্ত হুকুম ও নিয়ম পালন করো।" কিন্তু তারা সেই কথায় কান দেয়নি। **তাদের পূর্বপুরুষেরা, যারা তাদের মাবুদ আল্লাহর ওপর ভরসা করত না, তাদের মতোই তারা একগুঁয়েমি করত।**
>
> **তারা তাঁর সব নিয়ম, তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য স্থাপন করা তাঁর ব্যবস্থা এবং তাদের কাছে তাঁর দেওয়া সাবধান-বাণী মানতে অস্বীকার করেছিল। তারা অসাড় মূর্তির পূজা করে নিজেরাও অসাড় হয়ে পড়েছিল। মাবুদ যাদের মতো চলতে বনি-ইসরাঈলীদের নিষেধ করেছিলেন তারা তাদের চারপাশের সেই জাতিগুলোর মতোই চলত। তারা তাদের মাবুদ আল্লাহর সমস্ত হুকুম ত্যাগ করে নিজেদের জন্য ছাঁচে ফেলে দুটো বাছুরের মূর্তি এবং একটা আশেরা-খুঁটি তৈরী করে নিয়েছিল। তারা আকাশের তারাগুলোর পূজা করত এবং বা'ল দেবতার সেবা করত।**
>
> নিজের ছেলেমেয়েদের তারা আগুনে পুড়িয়ে বলি দিত। তারা গোনাপড়ার ও লক্ষণ দেখে ভবিষ্যতের কথা বলবার অভ্যাস করত এবং মাবুদের চোখে যা খারাপ সেই সব কাজ করবার জন্য নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে মাবুদকে রাগিয়ে তুলেছিল।
>
> **কাজেই ইসরাঈলের লোকদের ওপর মাবুদ রাগ হয়ে তাঁর সামনে থেকে তাঁদের দূর করে দিলেন।** বাকি ছিল কেবল এহুদা-গোষ্ঠী,
>
> কিন্তু এহুদা-গোষ্ঠীও তাদের মাবুদ আল্লাহর হুকুমমতো না চলে ইসরাঈল যা করত, তা-ই করতে লাগল।
>
> সে জন্য মাবুদ সমস্ত বনি-ইসরাঈলীদেরই বাতিল করে দিলেন। তিনি তাদের

---

[৩১৬] খ্রিষ্টান *বাইবেল/ইহুদি তানাখ* (Tanakh) এর যিশাইয় (Isaiah) ২ : ৫-৯ দ্রষ্টব্য

[৩১৭] খ্রিষ্টান *বাইবেল/ইহুদি তানাখ* (Tanakh) এর যিরমিয় (Jeremiah) ৩২ : ২৮-৩৫ দ্রষ্টব্য

[৩১৮] খ্রিষ্টান *বাইবেল/ইহুদি তানাখ* (Tanakh) এর যিহিষ্কেল (Ezekiel) ২০ : ৩১ দ্রষ্টব্য

কষ্টে ফেললেন এবং লুটেরাদের হাতে তুলে দিলেন, আর শেষে নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন।”[৩১৯]

ইহুদি তথা ইস্রায়েল জাতির নিজ ধর্মগ্রন্থই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের ইতিহাস পৌত্তলিকতা আর বহু দেবতার পূজায় ভরা। কাজেই চট করে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময়ে “ইহুদিরা সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী ছিল” বলে দেওয়াটা একটু কঠিন বৈকি।

চলুন এখন আমরা দেখি আমরা কোন প্রেক্ষাপটে বা কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি [সুরা তাওবাহ, ৯ : ৩০] নাজিল হয়েছিল।

> সাল্লাম ইবন মিশকাম, নু'মান ইবন আওফা, শাস ইবন কায়স ও মালেক ইবনুস সাইফ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমরা কীভাবে আপনার অনুসরণ করতে পারি, অথচ আপনি আমাদের কিবলা ত্যাগ করেছেন, আপনি উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে মেনে নেন না? তখন আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত নাজিল করেন।[৩২০]

সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক বিবরণ পাচ্ছি যে ইহুদিরা আসলেই উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলত।

> সুরা তাওবাহ এর ৩০নং আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : “‘ইহুদীরা বলে’ এই কথাটি একটি সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যদিও এর মানে সুনির্দিষ্ট, কারণ সব ইহুদি এমনটি [উজাইর আল্লাহর পুত্র] বলত না। এটা তো আল্লাহর ওই বক্তব্যের মতো “যাদের লোকেরা বলেছে যে, ...” (আলি ইমরান, ৩ : ১৭৩) অথচ সব লোক তা বলেনি।”[৩২১] বলা হয়, ইহুদীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার বক্তা হচ্ছে, সাল্লাম ইবন মিশকাম, নু'মান বিন আবু আওফা, শাস ইবন কায়স ও মালেক ইবনুস সাইফ। তারা এটা [অর্থাৎ উজাইর আল্লাহর পুত্র] নবী ﷺ-কে বলেছিল। আন-নাক্কাশ বলেন : ইহুদিদের মধ্যে এরূপ বলে থাকে এমন কেউ অবশিষ্ট নেই; বরং তারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যখন কোনো একজন এটি বলে, তখন তার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়, যতক্ষণ না বক্তব্যের কদর্যতা পুরো গোষ্ঠীর ওপর আরোপ হয়। যেহেতু তাদের মাঝে বক্তার খ্যাতি-প্রসিদ্ধি রয়েছে। কেননা,

---

[৩১৯] *বাইবেল*, ২ বাদশাহনামা/২ রাজাবলী (২ Kings) ১৭ : ১৩-২০ (কিতাবুল মোকাদ্দস অনুবাদ)

[৩২০] *তাবারী*, *সিরাত ইবন হিশাম*, ১/৫৭০

[৩২১] সুরা আলি ইমরানের ১৭৩ নং আয়াত—“যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় করো।...” —এ আয়াতে ‘লোকেরা’ কথাটি ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এখানে এ দ্বারা আরবের সকল লোককে বোঝানো হয়নি; বরং অল্প কিছু মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে।

খ্যাতিমান-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কথা সব সময়ই লোকদের মাঝে প্রচলিত-প্রখ্যাত হয় এবং একে ব্যবহার করে যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া হয়। সুতরাং এখান থেকেই এটি (বলা) শুদ্ধ হচ্ছে যে, 'গোষ্ঠী তার খ্যাতিমান ব্যক্তিদের (অনুরূপ) কথা বলে থাকে।'[৩২২]

ইমাম শাওকানী (র.) এর *ফাতহুল কাদিরেও* অনুরূপ মত ব্যক্ত করা হয়েছে।[৩২৩]

জি. ডি. নিউবাই তাঁর *আ হিস্টরি অফ দ্য জিউস অফ এরাবিয়া* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

"আমরা সহজেই ধরতে পারি যে হিজাজের (মক্কা-মদীনা) ইহুদিরা, যারা কি না সুস্পষ্টভাবেই মোরাকাবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মরমি ভাবধারায় আক্রান্ত ছিল, উজাইরকে সেই স্থান দিয়েছিল। এর কারণ ছিল তার কিতাবের অনুবাদের বিবরণ, তার ধার্মিকতা। এবং বিশেষত, ঈশ্বরের অনুলেখক হিসাবে তাকে হনোক (Enoch) এর সাথে তুলনা করা হতো। এ দ্বারা ঈশ্বরের পুত্রদের একজনকেও বোঝায়। এবং নিঃসন্দেহে তিনি ধর্মীয় নেতাদের সকল বৈশিষ্ট্য বহন করতেন (কুরআন, ৯:৩১ এ বর্ণিত 'আহবার'), যাকে ইহুদিরা বন্দনা করত।"[৩২৪]

ইমাম কুরতুবী (র.) ও ইমাম শাওকানী (র.) এর তাফসির থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আলোচ্য আয়াতে সকল ইহুদি সম্পর্কে এটা বলা হয়নি যে তারা উজাইরকে আল্লাহর পুত্র দাবি করে। বর্তমানকালেও ইহুদি ফির্কাগুলোর মধ্যে এমন বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময়ে আরবের ইহুদিরা [যারা ছিল ইয়েমেনী (Yemenite) দলীয় ইহুদি] উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করত। ইহুদিদের বহু ঈশ্বরের উপাসনার ইতিহাস, ঐতিহাসিক বিবরণ ইত্যাদি উপেক্ষা করে যারা এরপরেও কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান, তাদের উদ্দেশে বলব—সে সময়কার স্থানীয় ইহুদিদের এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে যদি কুরআন আসলেই মারাত্মক ভুল কোনো তথ্য দিত (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনেক সাহাবীরই সেটা চোখে পড়ত। মদীনাবাসী সাহাবীদের ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাস খুব ভালো করেই জানা ছিল; কেননা, মদীনায় তখন প্রচুর ইহুদি বাস করত। কুরআন

[৩২২] *কুরতুবী*, ৮/১১৬

[৩২৩] *ফাতহুল কাদির*, ২/৪০২

[৩২৪] G. D. Newby, *A History Of The Jews Of Arabia*, 1988, University Of South Carolina Press, p. 61

যদি সত্যিই ইহুদিদের বিশ্বাসের ব্যাপারে এমন ভুল তথ্য দিত, তাহলে সাহাবীরা বুঝতেন যে *কুরআন* মিথ্যা। তাহলে তাঁদের অনেকেই ইসলাম ত্যাগ করতেন। কিন্তু তাঁরা আদৌ এমন কিছু করেননি; বরং নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও *কুরআনের* ওপর বিশ্বাসে অটল ছিলেন। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, *কুরআন* মোটেও কোনো ভুল তথ্য দেয়নি এবং ইসলামবিরোধীদের অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই।

মুসলিমদের দুরবস্থা এবং ইসলামের সত্যতা

এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে মুসলিম উম্মাহ। দিকে দিকে ধ্বংস আর গণহত্যার কবলে পড়ছে তারা। কোথাও তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আবার কোথাও তারা কপর্দকহীন অবস্থায় দেশত্যাগ করছে, উদ্বাস্তু হচ্ছে। আমাদের বোনদের ইজ্জত এখন মুশরিকদের কাছে খেলনার বস্তু! যখন ইচ্ছা তারা এটা নিয়ে খেলতে পারে। এমনকি দুধের শিশুরাও ছাড়া পাচ্ছে না। অনাহারে, অর্ধাহারে, বোমার আঘাতে ওরা ওদের রবের নিকট চলে যাচ্ছে এ নিষ্ঠুর পৃথিবীর ওপর একরাশ অভিমান নিয়ে। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, আরাকান, কাশ্মির—মুসলিমরা সর্বত্রই শুনছে ধ্বংস আর মৃত্যুর পদধ্বনি। মুসলিমদের এই দুরবস্থা দেখে অনলাইন জগতে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ঝড় তুলছে ইসলামের শত্রু নাস্তিক-মুক্তমনারা। তারা অট্টহাস্য করে বলে চলছে (অথবা লিখে যাচ্ছে)—ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হতো, তাহলে মুসলিমদের আজ এই অবস্থা কেন? তারা এভাবে মার খায় কেন? ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যদি এতই খারাপ হতো, তাহলে তারা আজ এত ভালো অবস্থায় কেন? মুসলিমরা তাদের হাতে এভাবে 'সাইজ' হয় কেন? আল্লাহ যদি থেকেই থাকেন, তিনি মুসলিমদের রক্ষা করেন না কেন? তাদের এই ক্রমাগত বিদ্বেষমূলক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক সময় সরলপ্রাণ মুসলিমদের মনেও এ প্রশ্নের উদ্রেক হয়—মুসলিমদের এত দুরবস্থা কেন? অন্য ধর্মের লোকদের তো এমন হয় না; বরং কত সমৃদ্ধিতেই-না তারা বাস করে।

প্রথম কথা : নাস্তিক-মুক্তমনাদের এই নির্দয় পরিহাস প্রমাণ করে যে তারা মোটেও 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) না, তারা মোটেও 'মানবতাবাদী' (Humanist) না। তারা আসলে ইসলামবিদ্বেষী এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনুরাগী এক সম্প্রদায়, যারা স্বঘোষিত 'ইউরোপপন্থী' এবং যাদের শয়নে-স্বপনে শুধু জার্মানির ভিসা ঘোরে। সাদা

চামড়ার একজন ইহুদি বা খ্রিষ্টান নিহত হলে তাদের আর্তনাদে অনলাইন জগত ভারী হয়ে ওঠে। আর সে ঘটনার সাথে মুসলিম নামধারী কেউ জড়িত থাকলে তো কথাই নেই। ইসলামকে জঙ্গি-সন্ত্রাসী ধর্ম বলে তারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকে। ওদিকে রাশিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী সিরিয়ার নিরীহ বেসামরিক মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে গেলেও তাদের মোটেও বিচলিত হতে দেখা যায় না। খোঁজ নিলে দেখা যায় যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট একজন ধার্মিক অর্থোডক্স খ্রিষ্টান।[৩২৫] কিন্তু তাদের কাছে খ্রিষ্টানরা মোটেও 'জঙ্গি-বর্বর' না। কিংবা আরাকানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের মেরে-কেটে সাফ করে দিতে চাইলেও[৩২৬] তাদের কখনো বৌদ্ধধর্মকে 'সন্ত্রাসী ধর্ম' বলতে দেখা যায় না। কাজেই মুসলিমদের কখনোই উচিত না এসব হিপোক্রিট নাস্তিক-মুক্তমনাদের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া।

দ্বিতীয় কথা : যে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সমৃদ্ধির কথা বলে মুসলিমদের ব্যঙ্গ করা হয়, খোদ সেই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, সত্যধর্মের অনুসারীরাই বিধর্মীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, গণহত্যার শিকার হয় ও গৃহহারা হয়। এবং সবশেষে সত্যধর্মের অনুসারীদেরই স্রষ্টা রক্ষা করেন।

বাইবেলের পুরোনো নিয়ম অংশ (Old Testament)-কে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরের বাণী হিসাবে বিশ্বাস করে। এই পুরোনো নিয়ম অংশের গ্রন্থ যাত্রাপুস্তক (Exodus) এ উল্লেখ আছে—বনী ইস্রাঈল জাতিকে মিসরের ফিরাউন কী অমানুষিক নির্যাতন করত। তাদের বহু যুগ ধরে কৃতদাসের মতো রাখা হতো, অমানবিকভাবে পরিশ্রম করানো হতো, এমনকি তাদের ছেলে শিশুদের হত্যা করা হতো।[৩২৭] অবশেষে ঈশ্বর তাদের ফরিয়াদ শোনেন এবং ভাববাদী মোশির [নবী মুসা (আ.)/prophet Moses] দ্বারা তাদের এ দশা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।[৩২৮] বাইবেলে আরও উল্লেখ আছে যে, এর শত শত বছর পরে বনী ইস্রাঈল

---

[৩২৫] ■ "Putin and the 'triumph of Christianity' in Russia _ Russia _ Al Jazeera"
https://www.aljazeera.com/blogs/europe/2017/10/putin-triumph-christianity-russia-171018073916624.html
■ "Putin Hails 'Eternal Christian Values' Amid Orthodox Christmas Celebrations"
https://www.rferl.org/a/putin-christmas-russia-belarus-georgia-kazakhstan-macedonia-moldova-serbia-ukraine-armenia/28959952.html

[৩২৬] "'It only takes one terrorist' _ the Buddhist monk who reviles Myanmar's Muslims _ Marella Oppenheim _ Global development _ The Guardian"
https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/12/only-takes-one-terrorist-buddhist-monk-reviles-myanmar-muslims-rohingya-refugees-ashin-wirathu

[৩২৭] *বাইবেল*, যাত্রাপুস্তক (Exodus), ১ : ১১-২২ দ্রষ্টব্য

[৩২৮] *বাইবেল*, যাত্রাপুস্তক (Exodus), ৩ : ৬-১০ দ্রষ্টব্য

জাতির মানুষেরা ঈশ্বরের বিধান থেকে দূরে সরে গিয়ে পাপে লিপ্ত হলে ঈশ্বর তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তিনি অবিশ্বাসী জাতির দ্বারা বনী ইস্রাঈলের মানুষদের শাস্তি দেন। ব্যাবিলনের রাজা বখত নাসর (Nebuchadnezzar/নবূখদ্নিৎসর) জেরুজালেমের মহামন্দির (Temple Mount/আল-আকসা মসজিদ) পুড়িয়ে দেয় ও জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে দেয়। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ, যিহুদা ও জেরুজালেমের সমস্ত ব্যক্তিকে নির্বিচারে হত্যা করে আর যারা বেঁচে ছিল তাদের কৃতদাস বানিয়ে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়।[৩২৯] কিন্তু ঈশ্বর তাদের পুনরায় উদ্ধার করেন। ৭০ বছর পরে ইস্রা (Ezra/উজাইর) এর নেতৃত্বে বনী ইস্রাঈলের মানুষেরা আবার জেরুজালেমে ফিরে আসে।[৩৩০] এরপর তারা পুনরায় মহামন্দির নির্মাণ করে। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত বিশ্বাসীদের জয় হয়।

বাইবেলের নতুন নিয়ম (New Testament) অংশে উল্লেখ আছে, যিশু খ্রিষ্টের [ঈসা (আ.)] অনুসারীদের ওপর কী ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়েছে। যিশুর অনুসারী স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।[৩৩১] যাকোবকে (James) হত্যা করা হয়, পিতরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।[৩৩২] বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রেও জানা যায় যে প্রথম শতাব্দীতে খ্রিষ্টানদের ওপর বহু নির্যাতন চালানো হয়েছে। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে যেতেন, তাদের ওপর জুলুম চালিয়ে হত্যা করে ফেলা হতো।[৩৩৩] *বাইবেলে* যিশু বলছেন যে, তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বাসীদের নিকট পুনরাগমন করবেন।

> “ভাই ভাইকে এবং বাবা ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য ধরিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। আমার নামের জন্য সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে স্থির থাকবে সে-ই রক্ষা পাবে। যখন তারা এক শহরে তোমাদের ওপর নির্যাতন করবে, তখন তোমরা অন্য শহরে পালিয়ে যেয়ো। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মানবপুত্র [যিশু]

---

[৩২৯] ■ *বাইবেল*, ২ বংশাবলী (২ Chronicles) অধ্যায় ৩৬ দ্রষ্টব্য
■ বাইবেল, ২ রাজাবলী (২ Kings) অধ্যায় ২৫ দ্রষ্টব্য

[৩৩০] *বাইবেল*, ইস্রা (Ezra) ৮ : ৩২ দ্রষ্টব্য

[৩৩১] *বাইবেল*, শিষ্যচরিত (Acts) অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য

[৩৩২] *বাইবেল*, শিষ্যচরিত (Acts) অধ্যায় ১২ দ্রষ্টব্য

[৩৩৩] ■ "BBC - History - Ancient History in depth_ Christianity and the Roman Empire" http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/christianityromanempire_article_01.shtml
■ "Persecution in the Early Church_ Did You Know_ _ Christian History" http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-27/persecution-in-early-church-did-you-know.html

ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা ইস্রায়েলের সমস্ত শহরে তোমাদের কাজ শেষ করতে পারবে না।”[৩৩৪]

অর্থাৎ সত্যিকারের বিশ্বাসীরা নির্যাতিত হয়, হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়, নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদও হয়, কিন্তু এর মানে এই নয় যে তাদের আদর্শ মিথ্যা। শেষ পর্যন্ত বিজয় স্রষ্টার সত্যিকার বিশ্বাসীদেরই হয়। সমৃদ্ধ অবস্থায় থাকা আর শক্তিশালী হবার অর্থই এটা নয় যে, কেউ সঠিক পথে আছে। এটাই ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য। অথচ এই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের উদাহরণ টেনে মুসলিমদের বিব্রত করতে চায় নাস্তিক-মুক্তমনারা।

বনী ইস্রাঈল জাতির ওপর অত্যাচারকারী মিসরের ফিরাউন কিংবা ব্যাবিলনের রাজা বখত নাসর এরাও অনেক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল। প্রথম শতকে খ্রিষ্টানদের ওপর জুলুম চালানো রোমান শাসকরাও অনুরূপ শক্তিশালী ছিল। ইহুদি আর খ্রিষ্টানরা ছিল দুর্বল। আজ যেমন মুসলিমরা দুর্বল আর ইহুদি-খ্রিষ্টানরা শক্তিশালী।

ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া তো অনেক দূরের কথা; বরং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ দ্বারা এখানে ইসলামের সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে!

ইসলামী বিশ্বাস হচ্ছে, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পূর্বসূরিরা ছিল নবীদের অনুসারী এবং তারাও ছিল মুসলিম। আল কুরআনেও বনী ইস্রাঈলের প্রতি ফিরাউনের জুলুমের কথা উল্লেখ আছে,

> “এবং যখন আমি তোমাদের ফিরআউনের সম্প্রদায় হতে বিমুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করত, তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত এবং তোমাদের কন্যাদের জীবিত রাখত। আর এতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ছিল মহা পরীক্ষা। এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআউনের স্বজনদের নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।”[৩৩৫]

আল কুরআনে বনী ইস্রাঈলের দুই বার জমিনে ফিতনা তৈরি ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের দ্বারা আযাবের শিকার হবার কথা উল্লেখ আছে।

> “এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইস্রাঈলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুই বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ঔদ্ধত্য দেখাবে

---

[৩৩৪] *বাইবেল*, মথি (Matthew) ১০ : ২১-২৩

[৩৩৫] *আল কুরআন*, বাকারাহ, ২ : ৪৯-৫০

মারাত্মকভাবে। অতঃপর এই দুই এর প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো তখন আমি তোমাদের ওপর আমার কিছু বান্দা পাঠালাম, যারা কঠোর যুদ্ধবাজ। অতঃপর তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। আর এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। তোমরা সৎ কাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য; অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে (অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম) যাতে তারা তোমাদের চেহারাসমূহ মলিন করে দেয়, আর যেন মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন ঢুকে পড়েছিল প্রথমবার এবং যাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়, যা ওদের কর্তৃত্বে ছিল। আশা করা যায় তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর রহম করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করো, তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন।

জাহান্নামকে আমি করেছি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার।"[৩৩৬]

ঈসা (আ.) এর সত্যিকার অনুসারীদের নির্যাতন করে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলবার একটি ঘটনাও আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

"ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা, (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন। যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল; এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদের নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব যাঁর। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। যারা মুমিন নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন-যন্ত্রণা। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা।"[৩৩৭]

হাদিসে উল্লেখিত আছে, পূর্বযুগের মুমিনদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে

---

[৩৩৬] *আল কুরআন*, বাকারাহ, ২ : ৪৯-৫০

[৩৩৭] ■ *আল কুরআন*, বুরুজ, ৮৫ : ৪-১১

■ বিস্তারিত ঘটনাটি উল্লেখ আছে সহীহ মুসলিমের ৭২৩৯ নং হাদিসে। হাদিসটি এখান থেকে পড়ুন : https://goo.gl/1dr1Tm

■ *ইবন হিশামের সীরাতুন নবী (স.)* গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তারা ছিল ঈসা (আ.) সত্যিকারের ধর্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলিম। আর তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিল ইয়েমেনের ইহুদি রাজা যু নাওয়াস।
দেখুন : *সীরাতুন নবী (স.)*, ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], পৃষ্ঠা : ৬৫-৬৮

ধরে আনা হতো, তাঁর জন্য গর্ত খুঁড়ে তাঁকে এর মধ্যে রাখা হতো। এরপর তাঁর মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু-খণ্ড করে ফেলা হতো। কারও কারও দেহের গোশতের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনি চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো। কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষাও তাঁকে তাঁর দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না।[৩৩৮] আগুনে পুড়ে মরা কিংবা করাতের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া সেই মুমিনরা ছিল প্রকৃত বিজয়ী; কেননা, আখিরাতে কেবল মুমিন বা বিশ্বাসীরাই জান্নাতবাসী হবে। সেটি হচ্ছে চিরস্থায়ী সুখের আবাস। যদিও পার্থিব দৃষ্টিতে তাদের পরাজিত বলে মনে হয়।

আজকের পৃথিবীতে মুসলিমরা দুর্দশায় নিপতিত, ঠিক যেরূপে অতীতে নবীদের অনুসারীরাও দুর্দশায় নিপতিত হতো। এই ব্যাপারটি কুরআন, হাদিস, বাইবেল—সকল সূত্র থেকে প্রমাণিত। মুসলিমদের নিকট বাইবেল কোনো দলিল নয়; বরং কুরআন-হাদিসের দলিলই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট।

বর্তমানে মুসলিমরা নিজ দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাস্তি ও পরীক্ষায় নিপতিত হচ্ছে। আল্লাহ চান মানুষ যেন তাঁর দ্বীনে ফিরে আসে। *আল কুরআনে* বলা হয়েছে :

> "স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৩৩৯]

বর্তমান এই দুরবস্থা মুসলিমদের জন্য পরীক্ষাও বটে। আল কুরআন বলা হয়েছে :

> "এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য ধারণকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।
>
> তারাই সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।"[৩৪০]

হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিন কোনো দুশ্চিন্তা, রোগ-ব্যাধি, বিপদে নিপতিত হলে, এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও, এর বিনিময়ে তার গুনাহ মোচন হয় এবং সওয়াব

---

[৩৩৮] দেখুন, *সহীহ বুখারী*, ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০; *রিয়াদুস সালিহীন*, ৪২

[৩৩৯] *আল কুরআন*, রুম, ৩০ : ৪১

[৩৪০] *আল কুরআন*, বাকারাহ, ২ : ১৫৫-১৫৭

লাভ করে।[৩৪১] কাজেই মুমিনদের জন্য হারানোর কিছুই নেই। ইহুদি, খ্রিষ্টান, শিয়া বা ধর্মহীনরা মুসলিমদের ওপর যতই জুলুম করুক, যতই দুর্দশা নেমে আসুক, মুসলিমদের জন্য এগুলো পরীক্ষা ও গুনাহ মাফের উপলক্ষ্য। কিন্তু এই জুলুমগুলো যারা করছে পরকালে কঠোর শাস্তি হবে তাদের পরিণতি। তাদের চাকচিক্য বা সমৃদ্ধি প্রকৃত মুমিনদের মোটেও বিভ্রান্ত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই মানুষের মাঝে ভালো ও খারাপ অবস্থানের আবর্তন ঘটান। এবং সবশেষে আল্লাহভীরু মুসলিমদেরই বিজয় ও শুভ পরিণতি নির্ধারিত।

আমরা যদি আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান নিয়ে বাঁচতে পারি, তবে আমাদের হারানোর কিছু নেই। এ পৃথিবীতে সুখের দেখা না পেলেও একদিন জান্নাতে আমরা সুখের দেখা পাব। ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম নেব।

পরাজিত হয়েও তাই আমরা জয়ী। আমাদের মাঝে তাই অনন্ত আশা। নাস্তিক-মুক্তমনাদের আশা কোথায়?

> "নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়। এটা হলো সামান্য ফায়দা—এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।
>
> কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাঁদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।"[৩৪২]

> "আর তোমরা নিরাশ হোয়ো না এবং দুঃখ কোরো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।
>
> তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।
>
> আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদের পাক-সাফ করতে চান এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দিতে চান।"[৩৪৩]

---

[৩৪১] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং ৬৪৫৪–৬৪৬৩ দ্রষ্টব্য। হাদিসগুলো এখান থেকে দেখা যেতে পারে : https://goo.gl/8R7u9Y

[৩৪২] *আল কুরআন*, আলি ইমরান, ৩ : ১৯৬-১৯৮

[৩৪৩] *আল কুরআন*, আলি ইমরান, ৩ : ১৩৯-১৪১

"এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যই শুভ পরিণাম।

যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য আছে এর চেয়েও উত্তম ফল। আর যারা মন্দ কাজ করে, তারা যা করেছে তাদের শুধু তারই শাস্তি দেওয়া হবে।"[৩৪৪]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে - তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তিনি তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই তো সত্যত্যাগী।

আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।

তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। তাদের আশ্রয়স্থল তো [জাহান্নামের] আগুন; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!"[৩৪৫]

---

[৩৪৪] *আল কুরআন*, কাসাস, ২৮ : ৮৩-৮৪

[৩৪৫] *আল কুরআন*, নুর ২৪ : ৫৫-৫৭

অবিচল আগন্তুক

আদী ইবন হাতিম ছিলেন ইয়েমেনের 'তাঈ' গোত্রের মানুষ। তিনি ছিলেন নিজ গোত্রের সর্দার। ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান।[৩৪৬] নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা শোনা যাক তাঁর নিজ জবানি থেকেই :

"আমি মদীনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপনীত হলাম। তারপর আমি মসজিদে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম করলাম।

তিনি বললেন, "আগন্তুকের পরিচয় কী?"

আমি বললাম, "আদী ইবন হাতিম।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে রওনা হলেন। ...তিনি আমাকে তাঁর সাথে নিয়ে চলতে উদ্যত হওয়ার মুহূর্তে অতি দুর্বল এক বৃদ্ধা নারী তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁকে দাঁড়াতে বলল। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সাথে তার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

তখন আমি মনে মনে বললাম, "লোকটি [মুহাম্মাদ ﷺ] তো রাজা-বাদশাহ্ না!"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সাথে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং খেজুরের ছালভর্তি একটা চামড়ার আসন এনে আমার পাশে রেখে দিয়ে বললেন, "বসো এটিতে।"

আমি বললাম, "বরং আপনিই বসুন।" তিনি বললেন, "না তুমিই....।"

আমি গদিতে বসলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতেই বসে পড়লেন।

---

[৩৪৬] *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৭।

আমি (আদী ইবন হাতিম) মনে মনে বললাম, এটাও কোনো রাজার আচরণ হতে পারে না![৩৪৭]

আদী ইবন হাতিম আশা করছিলেন যে, মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাঝে কিছু হলেও অন্তত রাজা-বাদশাহর আচরণের ছাপ থাকবে। কারণ, সে যুগে রাজা-বাদশাহদের জীবনাচারে থাকত সীমাহীন বিলাসিতার ছাপ। কিন্তু বিলাসিতা তো দূরের কথা, মদীনায় আদী বিন হাতিম দেখতে পেলেন এমন এক মানুষকে, যিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা নারীর প্রয়োজনের কথা শোনেন। যিনি নিজে মাটিতে বসে অতিথিকে গদিতে বসান।

তাঁর চমকের কিন্তু এখানেই শেষ ছিল না! কাহিনির বাকি অংশ শোনা যাক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আদী ইবন হাতিম, ইসলাম গ্রহণ করে নাও, নিরাপত্তা লাভ করবে।"

আমি (আদী ইবন হাতিম) বললাম, "আমি তো একটা ধর্ম অনুসরণ করে চলেছি।"

তিনি বললেন, "তোমার ধর্মের সম্পর্কে আমি তোমার চাইতে বেশি অবগত।"

আমি বললাম, "আমার ধর্ম সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন?"[৩৪৮]

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "বলো তো হে আদী ইবন হাতিম, তুমি কি 'রাকুসী'[৩৪৯] নও?"

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই বটে!

তিনি বললেন, "তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ লাভ করতে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "তোমার ধর্ম অনুযায়ী তো সেটা তোমার জন্য বৈধ ছিল না।"

আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, যথার্থ বলেছেন।"

---

[৩৪৭] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৫।

[৩৪৮] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৮-১২৯।

[৩৪৯] সে যুগের আরব অঞ্চলের এক বিশেষ খ্রিষ্টান-দল রাকুসী (رَكُوسِيًا)। মূলধারার খ্রিষ্টবাদ ও সাবিঈ মতবাদের মাঝামাঝি একটি মতবাদের অনুসারী সম্প্রদায় বিশেষ। তারিখ আত তাবারী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা : ৬৬ দ্রষ্টব্য।

অবিচল আগন্তুক

আদী ইবন হাতিম ছিলেন ইয়েমেনের 'তাঈ' গোত্রের মানুষ। তিনি ছিলেন নিজ গোত্রের সর্দার। ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান।[৩৪৬] নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা শোনা যাক তাঁর নিজ জবানি থেকেই :

"আমি মদীনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপনীত হলাম। তারপর আমি মসজিদে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম করলাম।

তিনি বললেন, "আগন্তুকের পরিচয় কী?"

আমি বললাম, "আদী ইবন হাতিম।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে রওনা হলেন। ...তিনি আমাকে তাঁর সাথে নিয়ে চলতে উদ্যত হওয়ার মুহূর্তে অতি দুর্বল এক বৃদ্ধা নারী তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁকে দাঁড়াতে বলল। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সাথে তার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

তখন আমি মনে মনে বললাম, "লোকটি [মুহাম্মাদ ﷺ] তো রাজা-বাদশাহ না!"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সাথে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং খেজুরের ছালভর্তি একটা চামড়ার আসন এনে আমার পাশে রেখে দিয়ে বললেন, "বসো এটিতে।"

আমি বললাম, "বরং আপনিই বসুন।" তিনি বললেন, "না তুমিই....।"

আমি গদিতে বসলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতেই বসে পড়লেন।

---

[৩৪৬] *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৭।

আমি (আদী ইবন হাতিম) মনে মনে বললাম, এটাও কোনো রাজার আচরণ হতে পারে না![৩৪৭]

আদী ইবন হাতিম আশা করছিলেন যে, মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাঝে কিছু হলেও অন্তত রাজা-বাদশাহর আচরণের ছাপ থাকবে। কারণ, সে যুগে রাজা-বাদশাহদের জীবনাচারে থাকত সীমাহীন বিলাসিতার ছাপ। কিন্তু বিলাসিতা তো দূরের কথা, মদীনায় আদী বিন হাতিম দেখতে পেলেন এমন এক মানুষকে, যিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা নারীর প্রয়োজনের কথা শোনেন। যিনি নিজে মাটিতে বসে অতিথিকে গদিতে বসান।

তাঁর চমকের কিন্তু এখানেই শেষ ছিল না! কাহিনির বাকি অংশ শোনা যাক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আদী ইবন হাতিম, ইসলাম গ্রহণ করে নাও, নিরাপত্তা লাভ করবে।"

আমি (আদী ইবন হাতিম) বললাম, "আমি তো একটা ধর্ম অনুসরণ করে চলেছি।"

তিনি বললেন, "তোমার ধর্মের সম্পর্কে আমি তোমার চাইতে বেশি অবগত।"

আমি বললাম, "আমার ধর্ম সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন?"[৩৪৮]

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "বলো তো হে আদী ইবন হাতিম, তুমি কি 'রাকুসী'[৩৪৯] নও?"

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই বটে!

তিনি বললেন, "তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ লাভ করতে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "তোমার ধর্ম অনুযায়ী তো সেটা তোমার জন্য বৈধ ছিল না।"

আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, যথার্থ বলেছেন।"

---

[৩৪৭] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৫।

[৩৪৮] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৮-১২৯।

[৩৪৯] সে যুগের আরব অঞ্চলের এক বিশেষ খ্রিষ্টান-দল রাকুসী (رَكُوسِيًا)। মূলধারার খ্রিষ্টবাদ ও সাবিঈ মতবাদের মাঝামাঝি একটি মতবাদের অনুসারী সম্প্রদায় বিশেষ। তারিখ আত তাবারী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা : ৬৬ দ্রষ্টব্য।

আদী বলেন, এতক্ষণে আমার বুঝতে বাকি থাকল না যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী। যা বলা হয় না, তাও তিনি জানেন।[৩৫০]

ঘটনার এ পর্যায়ে আমাদের জন্য কিছু ভাবনার খোরাক রয়েছে। খ্রিষ্টধর্মের বহু দলবিভাজন সেই প্রাচীনকাল থেকেই ছিল।[৩৫১] ৭ম শতাব্দীতেও অনেকগুলো খ্রিষ্টান ফির্কা বা দল (sect) আরব ভূমিতে ছিল। আদী বিন হাতিমের সাথে প্রথম দেখাতেই মুহাম্মাদ ﷺ বলে দিলেন তিনি কোনো খ্রিষ্ট ধর্মীয় দলের সদস্য। এরপর তাদের ধর্মবিশ্বাসের একটি বিশেষ বিধানও বলে দিলেন। কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে কি এমন কিছু করা সম্ভব? আদী ইবন হাতিমও এ ব্যাপারটি বেশ বুঝতে পারছিলেন।

মানুষের ভেতরে একটা প্রবৃত্তি থাকে যে, সেসব সময় শক্তিমানের অনুসরণ করতে চায়। আদী ইবন হাতিমও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

তখন তিনি [নবী ﷺ] বললেন, "শোনো, ইসলাম গ্রহণে তোমার জন্য বাধা কী তা আমি ভালো করেই জানি। তোমার ধারণা, দুর্বল শ্রেণির লোকেরা এ দ্বীনের অনুসারী হয়েছে। যাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই, ওদিকে গোটা আরব তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।... হীরা শহর কোথায় তুমি জানো?"

আমি (আদী ইবন হাতিম) বললাম, "তা দেখার সুযোগ হয়নি। তবে লোকমুখে তার কথা শুনেছি।"

তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন তার কসম! আল্লাহ অবশ্যই এ দ্বীনকে এমন পূর্ণতা দেবেন যে, কোনো হাওলানাশীনা (পর্দানশীন মহিলা) সুদূর হীরা থেকে সফর করে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে, তাতে কোনো লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে না (অর্থাৎ তার কোনো ভয় থাকবে না)। আর হরমুয-পুত্র

---

[৩৫০] *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবন হিশাম [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৯-২৫০।

[৩৫১] ■ "List of Christian denominations - Wikipedia"
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations
■ "GNOSTICS, THOMASINES AND EARLY CHRISTIAN SECTS _ Facts and Details"
http://factsanddetails.com/world/cat55/sub352/item1417.html
■ "BBC - History - Ancient History in depth_ Lost and Hidden Christianity"
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/losthiddenchristianity_article_01.shtml

খসরুর[৩৫২] ধনাগার অবশ্যই বিজিত হবে।"

"সেদিন দূরে নয়, যখন শুনতে পাবে বাবিলের[৩৫৩] শ্বেত প্রাসাদগুলো মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়ে গেছে।"[৩৫৪]

আমি বললাম, "সম্রাট হরমুযের পুত্রের ধনাগার!!"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ! হুরমুয-পুত্র খসরুর ধনভান্ডারই।"

আর সম্পদের এত ছড়াছড়ি হবে যে, তা নেওয়ার মতো কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[৩৫৫]

আদী ইবন হাতিম ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ চরিত্রমাধুর্য। এরপর লক্ষ করলেন ওহীর মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করার গুণ। এমন ভবিষ্যদ্বাণী, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। এগুলো নবীদের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম গ্রহণ করলেন আদী ইবন হাতিম। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু—আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর করা এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কি সত্য হয়েছিল? আদী ইবন হাতিম (রা.) নিজেই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে আদী (রা.) বলেছেন, "আমি দেখেছি যে, পর্দানশীন মহিলারা হীরা হতে এসে কা'বাঘরে তাওয়াফ করছে এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো কিছুরই ভয় নেই। তিনি আরও বলেছেন, 'আমি নিজেই সেসব লোকজনের মধ্যে ছিলাম, যারা হুরমুযের পুত্র খসরুর (কিসরা) ধন-ভান্ডার জয় করেছিল। তা ছাড়া, তোমাদের জীবন যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তোমরাও ওই সবকিছু দেখে নিতে পারবে, যা নবী আবুল কাসিম [মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপনাম] বলেছেন যে, মানুষ হাতভর্তি করে

---

[৩৫২] পারস্য সম্রাট খসরু বা কিসরা।
"...Khosrow II (Chosroes II in classical sources; Middle Persian: Husrō(y)), entitled "Aparvēz" ("The Victorious"), also Khusraw Parvēz (New Persian: خسرو پرویز), was the last great king of the Sasanian Empire, reigning from 590 to 628.
He was the son of Hormizd IV (reigned 579–590) and the grandson of Khosrow I (reigned 531–579). He was the last king of Persia to have a lengthy reign before the Muslim conquest of Iran, which began five years after his death by execution. .."
সূত্র : উইকিপিডিয়া
https://en.wikipedia.org/wiki/Khosrow_II

[৩৫৩] ব্যাবিলন (Babylon); তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের (Persian Empire) অন্তর্গত অঞ্চল।

[৩৫৪] বাবিলের শ্বেত প্রাসাদ বিজয়ের কথাটি ইবন হিশামের রেওয়ায়েতে আছে। ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫০ দ্রষ্টব্য।

[৩৫৫] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৯।

সোনা-রুপা বের করবে।"[৩৫৬]

সে সময়ে হীরা নগরী থেকে মক্কা পর্যন্ত যাত্রাপথটি ছিল লুটেরাদের দ্বারা ছিনতাই ও রাহাজানিতে পূর্ণ।[৩৫৭] এমন অপরাধপ্রবণ একটি যাত্রাপথ চরমভাবে নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন হয়ে যাবে—এমন জিনিস ভবিষ্যদ্বাণী করা কোনো সাধারণ কথা নয়। পারস্য সাম্রাজ্য ছিল সেকালের পরাশক্তি। সে সময়ের দুর্বল মুসলিমরা এমন পরাশক্তিকে পরাজিত করবে—এমন ভাবনা ছিল কষ্ট কল্পনারও অতীত। কিন্তু এমন একটি জিনিসের ব্যাপারেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। এমনকি যে রাজার পতন হবে তার নামটিও তিনি বলে দিয়েছিলেন। কোনো যুক্তিবান মানুষ কি এ রকম ব্যাপারগুলো 'স্রেফ কাকতালীয়' বলে উড়িয়ে দিতে পারবে?

যে মানুষটি স্বয়ং আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যে মানুষটি আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করেছেন, তাঁর ঈমান যে দৃঢ় হবে এটাই স্বাভাবিক। এবং হয়েছেও তা-ই। রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর কয়েকটি গোত্র ইসলাম ত্যাগ করেছিল। এর মধ্যে আদী (রা.) এর তাঈ গোত্রও ছিল। এ মিছিলের মাঝেও ইসলামে অবিচল ছিলেন আদী ইবন হাতিম (রা.)। শুধু তা-ই না, তাঁর একক প্রচেষ্টায় তাঁর সম্পূর্ণ গোত্র পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছিল।[৩৫৮]

এভাবেই চোখের সামনে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছেন আদী ইবন হাতিম (রা.)। এবং সে অনুযায়ী সর্বদা ইসলামের ওপর অবিচল ছিলেন তিনি। যেসব বস্তুবাদী গবেষক ইসলামী সূত্রগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চান, তাদের জন্য ভাবনার খোরাক হয়ে থাকুক এ বিষয়টি।

"...আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।"[৩৫৯]

---

[৩৫৬] *সহীহ বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫০৭; *আর রাহীকুল মাখতুম*, শফিউর রহমান মুবারকপুরী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃষ্ঠা : ৪৮৯।

[৩৫৭] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩০।

[৩৫৮] *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, ইমাম তাবারী (র.), খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৮৩

[৩৫৯] *আল কুরআন*, ত্ব-হা, ২০ : ১৩২

সমর্পণ প্রকাশন

এর প্রকাশিত বইসমূহ

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা .... ডা. রাফান আহমেদ

সংবিৎ .... জাকারিয়া মাসুদ

অ্যান্টিডোট .... আশরাফুল আলম সাকিফ

অন্ধকার থেকে আলোতে .... মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

জীবনের সহজ পাঠ .... রেহনুমা বিনত আনিস

সুবোধ .... আলী আবদুল্লাহ

রৌদ্রময়ী .... ১৬ জন লেখিকা

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) .... শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো .... শিহাব আহমেদ তুহিন

হুজুর হয়ে হাসো কেন? .... হুজুর হয়ে টিম

কিয়ামুল লাইল .... শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

বাতায়ন .... মুসুলিম মিডিয়া

সবর ও শোকর .... ইমাম ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)

প্রদীপ্ত কুটির .... আরিফুল ইসলাম

ভ্রান্তিবিলাস .... জাকারিয়া মাসুদ

[লেখক পরিচিতি]

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

জন্ম ১৯৯০ সালে, ঢাকায়। পিতা মো. মিজানুর রহমান। মাতা মাকসুদা আক্তার। পৈতৃক নিবাস ঝালকাঠি জেলায়। পড়াশুনা করেছেন ঐতিহ্যবাহী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল ও ঢাকা কলেজ থেকে। এরপর খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (KUET) ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ECE) বিভাগে।

অনলাইনে ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করেন তিনি। ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক অ্যাক্টিভিস্টদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ও তাদের মতবাদের অসারতা তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। ভবিষ্যতে দাওয়াহ নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করবার ইচ্ছা রাখেন তিনি। তার প্রকাশিত একক বই '*অন্ধকার থেকে আলোতে*'। সহলেখক হিসেবে কাজ করেছেন '*সত্যকথন*' ও '*প্রত্যাবর্তন*' বই দুটোতে।

ওয়েবসাইট :
www.response-to-anti-islam.com

অন্ধকার গুহা। মুখ খোলা, কিন্তু আলো আসছে না। আকাশে যে রোদ নেই! অবশেষে সূর্য উদিত হল। রোদের প্রথম সে পরশ ছড়িয়ে গেল প্রান্তরে, পাহাড়ে, দ্বীপান্তরে। সে আলো চুইঁয়ে ঢুকল আঁধার গুহাতেও।
আলো? সে এক আহ্বানের আলো।

কেমন করে এল সে আলো?
নগরীর পাহাড় থেকে অনেককাল আগে এক যুবক এলাকাবাসীকে ডেকেছিলেন। যিনি পরিচিত ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নামে। দস্যুরা আক্রমণ করেছে ভেবে সবাই পড়িমরি করে পাহাড়ের দিকে ছুটে গিয়েছিল সে ডাকে। কিন্তু না! তিনি দুনিয়ার বিপদের কথা জানাতে তাদের ডাকেননি। ডেকেছিলেন পরকালের ভয়াবহ বিপদের কথা জানাতে। কেউ শোনেনি। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় একসময় সে যুবকের দেখানো পথে বহু মানুষ আলোর দিশা পেয়েছিল।

আজ বহু বছর পর কিছু দস্যু সেই আলোর মশালকে নিভিয়ে দিতে পঙ্গপালের মতো আক্রমণ করেছে। ওদের লক্ষ্য, একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে দামি সম্পদ ঈমানকে ছিনিয়ে নেওয়া। মুসলিমদের জীবনটাকে উদ্দেশ্যহীন বানিয়ে ফেলা। অন্ধকার জগতের সেই ডাকুদের বিরুদ্ধে এ বই ক্ষুদ্র এক প্রচেষ্টামাত্র। যেন ঈমানদাররা তাদের হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর গুহার অধিবাসীরা ফিরে আসে অন্ধকার থেকে আলোতে।